আলোয় অন্ধকারে

শক্তিপদ রাজগুরু

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৭১

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন—অনুপ রায়
মুদ্রণ—রিপ্রোডাকসান সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও নব মুদ্রণ, ১ বি রাজা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯
হইতে শ্রীকমল মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত

আলোয় অন্ধকারে

ইরা প্রথম প্রথম আসতো না।

বিয়ের পর এখানের বাসায় এসে উঠেছিল। সুবিনয় ব্যস্ত তার পড়াশোনা আর কলেজ নিয়ে।

বাড়ির পুরানো কাজের লোক বনমালীই এসব করতো। সুবিনয়ের বহু-দিনের সঙ্গী কাম সংসারের ম্যানেজার সে।

কিন্তু ক'দিনেই বুঝেছিল ইরা যে বনমালীদাও তার মনিব ওই আপনভোলা সুবিনয়ের মতই পরম দার্শনিক। নুন, লঙ্কা কেনা হয় নি, (প্রায়ই বাজারে এসে এটা ওটা কিনতে ভুলে যায় বনমালী) রান্নায় সেদিন নুন লঙ্কাও পড়ে না। তেল ফুরিয়ে গেছে। আবার কে বাজারে যায়। সুবিনয় বলে—বয়েলড ভেজিটেবিল খাওয়াই ভালো বুনুদা। তাই হোক আজ।

ওরা আলুনি, সেদ্ধ তরকারীই খেয়ে নেয় তৃপ্তি ভরে। ইরা দেখে আর হাসে।

তাই নিজেই এই দায়টা তুলে নেয় সে নিজের কাঁধে। সে আজ ক'বছর আগেকার কথা।

তারপর ইরার সংসারে এসেছে তার ছেলে, মেয়ে। শুভা বিমু।

ছেলেমেয়েদের আসার পর আরও কাজ বেড়েছে। তাদের পিছনেও সময় যায়। তাদের দেখাশোনা করা, তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা।

তাই ইরাকেই এখন বাজারে আসতে হয়। হাতে সময় বেশী থাকে না।

সব যেন ছক বাঁধা। ওদের এখন স্কুলে পাঠাতে হয়।

তার আগে ব্রেকফাস্ট দিতে হবে।

ইরা তাই বাজার সেরে তাড়াতাড়ি ফিরতে চায় বাড়িতে। কিন্তু বাজার বসতেও দেরী হয়।

সামান্য কিছু দোকান ছাড়া সরাসরি ট্রেনে মফঃস্বল-এর গ্রাম অঞ্চল থেকে চাষী, ফড়েরা শব্জীপত্র আনাজ এসব নিয়ে আসে।

ওদের কাছে সব শাকশব্জী তাজা পাওয়া যায়, দোকানে কতদিনের বাসি পোলট্রির ডিম মেলে আর ওদের ওই গ্রামের চাষীদের কাছে পাওয়া যায় ঘরের তাজা হাস মুরগীর ডিম।

শুভা, বিমু পোলট্রির ডিম পছন্দ করে না।

তাই ওদের কাছ থেকেই ডিম নিতে হয়।

মাছও টাটকা মেলে ভেড়ির মাছের বিক্রেতাদের কাছে। তাই অপেক্ষা করতে হয়।

কোনমতে সেদিন বাজার সেরে বের হয়ে আসছে ইরা।

বাড়ি ফিরতে হবে।

বাজারের বাইরে এসে শিবুর দোকান থেকে রুটি মাখন কিনে ওদিকে রাস্তা পার হয়ে রিক্সার সন্ধানে যাচ্ছে।

সামনেই পথচলতি রিক্সাটাকে পেয়ে তাকে থামিয়ে উঠে পড়ে। রিক্সাওয়ালারা চেনে বাড়ির বৌ-ঝিদের।

চলেছে সে ইরাকে নিয়ে।

শহরের মধ্যবিত্ত লোকদের এলাকা। একটা রিকশায় বাজার করে ফিরছে ইরা, সরু পথ। একটা গাড়ি বিকট হর্ন দিয়ে পাশে এসে দাঁড়াল।

মিঃ সোম গাড়ি থামিয়ে বলে বাড়ি যাবেন তো। উঠে আসুন—মিসেস ঘোষ!

ইরা দেখছে গাড়িটা।

অধ্যাপক সোম বলে—কিনলাম। রিকশায় যাতায়াত করা—হ্যাকনিড! আসুন—

ইরা বলে—ধন্যবাদ। আপনি যান—আমি ওষুধের দোকান হয়ে যাবো প্রফেসার সোম!

গাড়িটা ইরার অতৃপ্ত মুখের উপর এক ঝলক পেট্রলের ধোঁয়া ছেড়ে বের হয়ে গেল। ইরা রিকশাওয়ালাকে বলে—চালা।

ছোট বাড়িটা—ওদিকে দেখা যায় প্রফেসর সোমের বাড়ি। বাড়িটা দোতলা—আশপাশের বাড়িগুলোও দোতলা ও তিনতলা। প্রফেসর সোমের বাড়ির ঘরে আট দশটি ছেলে পড়ছে। প্রফেসর সোম নোট দিচ্ছেন, অনেকে মাইনেও দেয়। টাকার লেন দেন চলছে, দেখা যায় জানলা দিয়ে ইরার রিকশাটা আসছে পথ দিয়ে।

ইরাও দেখেছে ওর বাড়ি—ওই ছাত্র-ব্যবসাটা।

রিকশাটা এসে ওদিকের সাধারণ একতলা বাড়ির সামনে থামলো। ইরা ভাড়া মিটিয়ে বাড়ি ঢোকে। নেমপ্লেটে দেখা যায়, ডঃ সুবিনয় ঘোষ, অধ্যাপক।

সুবিনয় নিজের পড়ার ঘরে রাশীকৃত বই ঘেঁটে কি সব লিখে চলেছে। কার পায়ের শব্দে খাতায় নজর রেখে বলে—বনমালীদা, একটু চা—

পিছন ফিরে ইরাকে দেখে বলে—তুমি! বাজার হয়ে গেল? বনমালীদাকে না পাঠিয়ে নিজে কেন যে যাও আলু-পটলের হিসাব করতে—

ইরা বলে—যেতে হয় প্রফেসর সাব। আলু-পটলের হিসাব তো নিজে রাখলে না, এদিকে বলো মাপা মাইনে, সুতরাং সংসার চালাতে গিয়ে আমাকেই এসব রাখতে হয়।

সুবিনয় বলে—তা সত্যি। তোমার দায়ই বাড়িয়েছি ইরা।

—থাক! হ্যাঁ দেখলাম তোমার বন্ধু ওই প্রফেসর সোম গাড়ি কিনেছে!

ইরার কথায় সুবিনয় বলে—তা কিনতে পারে। কলেজের পুরো মাইনে ওর লাভ, আর তিন শিফ্‌টে ছাত্র পড়িয়ে যা পায়—গাড়ি তো কিনবেই। শুনি কোনো কনট্রাকটারি ফার্মের ও নাকি পার্টনার—

ইরা বলে—হিসেবী লোক বলতে হবে।

সুবিনয় বলে—তা সত্যি। সেদিক থেকে এমনি একটা বেহিসেবী লোককে বিয়ে করে ঠকেছো, তোমার শখ সাধ কিছুই মেটাতে পারিনি। ভাড়া বাড়িতেই রয়েছো—রিকশায় যাতায়াত করতে হয়।

ইরা বলে—থামো তো। শুরু হলো লেকচার। অধ্যাপক তো, ঘণ্টা না বাজলে লেকচার থামবে না! চা চাইলে না? পাঠাচ্ছি।

ইরা চলে গেল ভিতরে।

ইরার সংসারে তার ছেলে মেয়ে আর স্বামী।

ইরা নিজেই রান্নাবান্না করে। রান্নাঘরে গিয়ে দেখে বনমালীদা কি রাঁধতে ব্যস্ত। বয়স হয়েছে বনমালীর। এ বাড়ির পুরোনো লোক। সুবিনয়কে সে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে।

ইরা বলে—মাছগুলো ধুয়ে বেছে দাও বনুদা, রান্না আমিই করছি। আর দাদাবাবুর জন্য এক কাপ চা করে দাও।

ইরা এবার সংসারের কাজে ডুবে যায়।

প্রথম প্রথম তার মনে এই জীবনযাত্রাটা ছিল একটা স্বপ্নের মত।

সুবিনয় আর সে।

ইরা নিজে দেখে শুনেই সুবিনয়কে বিয়ে করেছিল। তার সংসারের ব্যাপারটা আগেই দেখেছিল।

আর সানন্দে সেই অগোছালো মানুষ আর তার সংসারের ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল।

সেই দায়দায়িত্ব আজও পালন করে চলেছে সে।

ওদিকে ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাবার সময় হয়ে এসেছে। তাদের খাবার দিতে হবে।

ইরা কোন মতে মাছের ঝোল আর আলু ডিমসেদ্ধ করে ওদের খাবার দেয়।

—চটপট খেয়ে নাও শুভা বিমু।

ওদের তখন জামা-কাপড় পরা নিয়ে খুনসুটি শুরু হয়েছে। ইরা বলে—হল তোমাদের?

শুভা বলে—হয়েছে মা মণি! বিমু এখনও চুলই আঁচড়াচ্ছে!

ইরা ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে—আর কত দেরী করবে? ওকে প্যান্ট জামা পরিয়ে দাও।

শুভাই বড়, তাই বিমুর ওই ব্যাপারগুলো তাকেই করতে হয়। কিন্তু বিমু প্রতিবাদ করে—এখন বড় হয়েছি না? নিজেই পরতে পারবো!

ইরা এসে তাদের দুজনকে তৈরী করে নিয়ে গিয়ে টেবিলে বসায়।

—খেয়ে নাও।

খাওয়া নিয়েই যত ঝামেলা। বিমু এটা খাবে না, ওটা খাবে না! তাই নিয়ে ঝকমারি।

শেষ অবধি কোন রকমে ওদের খাইয়ে, ইউনিফর্ম পরিয়ে বই-এর ব্যাগ, টিফিন-বক্স, ওয়াটার বটল সব গুছিয়ে নিয়ে আসে বাইরে।

স্কুল এখান থেকে বেশ একটু দূরে।

তাই ওদের আনা-নেওয়ার জন্য একটা রিক্সা ঠিক করা আছে।

সে আবার কোন কোনদিন সময়ে আসে না।

কোথায়ও নগদ দামে ভাড়া পেল তো সেই সওয়ারীকে পৌঁছে দিতে যায়। নগদ প্রাপ্তিযোগ ছাড়া যায় না। তাই সেদিন এদেরও অপেক্ষা করতে হয়। রিক্সাওয়ালা মদনের আজ দেখা নেই এখনও।

অধৈর্য হয়ে ওঠে ইরা।

শুভা, বিমুও ছটফট করে—দেরী হয়ে যাবে মা স্কুলে। প্রেয়ারের পর ঢুকলে দিদিমণি কটমট করে চায়!

ইরার মনে পড়ে প্রফেসার সোমের সেই গাড়ির কথা। প্রফেসার সোমও তার স্বামীর কলেজে কাজ করেন। সেদিক থেকে সুবিনয়ের নাম ডাক বেশী—সিনিয়র প্রফেসার সে। কিন্তু তার গাড়ি তো দূরের কথা। বাড়িতে রান্নার লোকও নেই। ইরাকেই সব করতে হয়। ছেলেমেয়েদের যাতায়াত করতে হয় রিক্সাতেই, না হলে পায়ে হেঁটে, নিজেদের কথা ছেড়েই দিল।

ইরা এসব ভাবতো না। ইদানীং আশপাশের বাতাবরণ যেন বদলে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। পরিবেশও। তাই এই ভাবনাগুলো জাগছে এখন মনে।

রিক্সার বেলের শব্দ শোনা যায়।

মদন এসে পড়েছে রিক্সা নিয়ে। ইরা বলে—দেরী হলো কেন?

মদনের জবাবগুলো ঠোঁটস্থ থাকে। বলে সে—চাকা পাংচার হয়ে গেল বৌদি, সারাতে দেরী হয়ে গেল। উঠে পড়ো—মটর গাড়ির চেয়ে জোরে নে যাবো, স্কুলে লেট হবে না।

রিক্সায় ওদের তুলে ইরা বলে—এত জোরে যেতে হবে না। কোথায় কি হবে। আস্তেই যাও।

ওদের স্কুলে পাঠিয়ে ইরা এবার বাড়িতে ফিরে আসে। একটা অধ্যায় চুকলো। এবার সুবিনয়-এর ব্যাপার আছে।

কিচেনে ঢুকে রান্নার বাকী ব্যাপার নিয়ে পড়ে এবার ইরা। সুবিনয়-এর অবশ্য এসব নিয়ে কোন মাথাব্যথাই নেই। সে তার কাজ নিয়েই থাকবে। যত মাথাব্যথা ইরারই।

সুবিনয় পড়াশোনা লেখা নিয়েই থাকে। ঘড়িতে এগারোটা বাজে। তন্ময় হয়ে কাজ করছে সুবিনয়।

—কলেজের দেরি হয়ে গেল যে!

চাইল সুবিনয় ইরার ডাকে। সুবিনয় বলে—তাই তো! সেমিনারের পেপারটা ভেবেছিলাম শেষ করতে পারবো—হলো না। বুঝলে ইরা—চোল ডায়নাস্টি, নায়ক রাজবংশ—গুপ্ত যুগ—সব কিছুর মধ্যে একটা সাযুজ্য—নিবিড় সাযুজ্য দেখা যায়। শিল্পকলা সাহিত্যের ধারাতেও ইতিহাসের তত্ত্ব।

ইরা বইপত্র গোছাচ্ছে, পর্দাগুলো নামাচ্ছে।

ইরা বলে—এটা ক্লাস নয় প্রফেসর সাহেব। আর আমিও ছাত্রী নই—

হাসে সুবিনয়—সরি। তবে এককালে তো ছাত্রী ছিলে। সেই প্রথম পরিচয়ের দিনগুলো মনে পড়ে।

ইরা বলে—তখন তো মন পড়েছিল দিদির উপরই!

সুবিনয়ের চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের কথা।

কমনরুমে একাই বসে আছে সুবিনয়। একটি মেয়ে ঢুকছে, সে ইরার দিদি মীরা। মেয়েটি ভালো ছাত্রী, সংযত ওর আচরণ।

মীরা বলে—দুদিন কলেজে আসতে পারিনি। গুপ্ত পিরিয়েডের উপর নোট-গুলোও পাইনি। তাই এসেছিলাম স্যার।

মীরার এই আগ্রহ দেখে সুবিনয় বলে—বোসো। এক পিরিয়ড অফ আছে আমার। ওগুলো দেখে নাও।

মীরা আর ইরা দুই বোন।

বিধাতা তাদের দুজনকে নিয়েই কি যেন একটা নিষ্ঠুর খেলাই খেলতে চেয়েছিলেন।

একবৃন্তে তারা যেন দুটি ফুল।

মীরা ইরা যমজ বোন। দুজনেই সুন্দরী, একই বর্ণ। নাক মুখ চোখও দুজনের এক ছাঁচে গড়া। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকলে তাকে চেয়ে দেখে ভুলই করে কে ইরা কে মীরা।

ওদের মা-বাবাও করতো। এখনও করে।

তাই তারা দুজনকে চেনার জন্য দুই রং এর পোষাক পরাতো। চুলের ফিতের রংও থাকতো দুজনের দুরকম।

ক্রমশঃ সেই রং এর পার্থক্যই ওদের চেনার উপায় হয়ে দাঁড়ালো।

মীরা পছন্দ করে লাল কিংবা লাউড কোন রং।

তার শাড়ি জামায় সেই রংই ব্যবহার করে। এমনিতে মীরা একটু বেশী উচ্ছল। ডাকাবুকো, বেপরোয়া ধরণের মেয়ে।

স্কুলেও ছিল খেলাধুলায় বেশী উৎসাহী।

কলেজে এসে যৌবনবতী মেয়েটির উচ্ছলতা কমেনি। খেলাধুলায়, ছাত্র ইউনিয়নে সব ক্ষেত্রেই সে এগিয়ে থাকে। কমনরুমের পাণ্ডা। তার মনে একটা দুর্বার তেজ যেন লুকিয়ে আছে প্রকাশের অপেক্ষায়।

তার তুলনায় ইরা অনেক শান্ত। সে খেলাধুলো ও কলেজ ইউনিয়ন নিয়ে থাকে না। একটু চাপা স্বভাবের। গান নিয়েই থাকে বাড়িতে। একটু নীরবই থাকে।

কিন্তু দিদির এই জনপ্রিয়তাকে ইরা মনে মনে হিংসা করে। তার নীরব স্বভাবের অতলে হয়তো কোথায় লোভী স্বার্থপর একটা সত্তা রয়ে গেছে। যার পুরো পরিচয় ইরাও জানে না।

ইরা দেখে মীরার এই ব্যাপারটা।

মীরা প্রফেসার সুবিনয় ঘোষের দিকে কেমন এগোতে চায় পড়ার ছল করেই।

ইরার মনে কোথায় বাজে কথাটা।

কলেজে ইরারও কিছু নাম আছে। বিশেষ করে গানের ব্যাপারে।

সেই সুবাদে সুবিনয় ঘোষের সান্নিধ্যে এসেছে সে।

কারণ কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোর ভার সুবিনয়বাবুর উপরই।

ইরা চিনেছে মানুষটিকে।

শুনেছে ওর সম্বন্ধে অনেক কথা। বিয়ে-থা করেন নি। লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত।

বেশ সহজ সরল মানুষ।

মীরাকে তার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে ইরার ভালো লাগে না ব্যাপারটা।

কেন জানে না ইরা মীরার ওই বেপরোয়া ভাবটাকে ঠিক সমর্থন করে না। দুজনে বাড়িতে একত্রেই মানুষ। এখনও এক ঘরে দুই খাটে থাকে।

কিন্তু সেই দুটো খাটের মধ্যে যেন অনেক ব্যবধানই রয়ে গেছে। মীরা নিজের নিয়েই ব্যস্ত। কলেজে কোন ছেলে কি করেছে। কে তাকে সিনেমায় নিয়ে যেতে চেয়েছে। ও কি বলেছে তাকে। এই কথাই জোর গলায় শোনায়।

ইরা বলে ঠাণ্ডা গলায়, শুয়ে পড় দিদি, রাত হয়েছে। আলো নিভিয়ে দে।

মীরা অবাক হয়—তুই কি রে? ঠিক করে বল তো—তোকে কেউ কিছু বলে না? ওই শুভেন্দু!

ইরা বলে—না তো!

মীরা অবাক হয়। বলে—সেকি রে!

ইরা চুপচাপই থাকে। সেদিন কমনরুমে তাদের ক্লাশের নমিতাই খবরটা দেয়।

—মীরা দেখলাম এবার প্রফেসার ঘোষ এর স্পেশাল ক্লাসে আসছে। ব্যাপার কি রে?

ইরা কথা শোনে। তার মনেও একটা প্রশ্ন জাগে। কিন্তু চেপে যায়। বলে সে—কই জানি না তো!

তবু ইরা মন থেকে কথাটা ঝেড়ে ফেলতে পারে না। তাই সে ভাবছে এ নিয়ে একটা ব্যবস্থা তাকেও নিতে হবে।

মীরার এই লোভী হাতটাকে সে আর বেশী এগোতে দেবে না।

তাই ইরা মীরার ব্যাপারেও কলেজে একটু চোখ কান খুলে রাখে।

মীরা প্রথমে সহজভাবেই পড়া জানতে গেছল প্রফেসর সুবিনয় ঘোষের কাছে, কিন্তু তার অজান্তেই ক্রমশঃ মীরা সেই মুহূর্তগুলো নিয়ে স্বপ্ন দেখে। দু'একদিন করিডরে দাঁড়িয়ে থাকে ওই সুবিনয়ের প্রতীক্ষায়। একটু হাসিই মীরার মনে ঝড় আনে।

ইরাও দেখেছে সেটা। সেদিন করিডরে দাঁড়িয়ে আছে ইরা, সুবিনয় ক্লাস থেকে-লাইব্রেরীতে যাচ্ছে। সুবিনয় বলে—পড়াশোনা ভালো হচ্ছে তো মীরা! দরকার হলে এসো—

ইরা চাইল। মীরা ভেবেছে তাকে। ইরা ঘাড় নাড়ে। ইরা বেশ বুঝেছে মীরা কিছুটা এগিয়েছে সুবিনয়ের দিকে।

মীরার মনেও এমনি একটা রেশ জাগে। বাড়িতে ইরা বলে—কিরে মীরা, প্রফেসর ঘোষ-এর কাছে পড়ছিস নাকি?

মীরা বলে—উনি প্রাইভেট টুইশানি করেন না। কলেজেই এক-আধটু দেখিয়ে নিই।

ইরা বলে, আর কাউকে তো কোচিং দেয় না। তোকে দেখছি স্পেশাল—পড় বাবা। তুইই পড়। এত পড়াশোনা আমার ভালো লাগে না। কলেজ সোশালের কামেলায় ডুবে গেছি।

ইরা গান গায় ভালো। রবীন্দ্রসঙ্গীত তার প্রিয়। মীরা বলে—আমার বাপু হিন্দী গানই পছন্দ। বেশ লাইফ ফোর্স আছে। কলেজের ফাংশানে তো আমাকে চান্সই দেবে না।

ইরা বলে—সে কি রে! সুবিনয়বাবুই তো এসবের চার্জে। তোর তো হাতের লোক!

—মারবো এক থাপ্পড়! মীরা হাসছে।

অবশ্য বোনের কথাটাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না মীরা।

মীরা মনে মনে স্বপ্ন দেখে সুবিনয়কে ঘিরে। একটি সুন্দর ঘরের স্বপ্নই। প্রেমের এই প্রকাশ তার মনে রামধনুর রং এনেছে।

কলেজ ফ্যাংশনে গাইছে ইরা সেদিন।

জীবনে যত পূজা হল না সারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা।

…সুন্দর সুরেলা গলা, শান্ত বিনম্র চেহারা ওর। সুর সারা হলে ছড়িয়ে পড়েছে। সুবিনয়ও রয়েছে। ওই ব্যাকুল সুরের রেশ তার মন ভরিয়ে তুলেছে কি নীরব আকুতিতে।

ইরার চমক ভাঙে অভিনন্দনের হাততালিতে। সুবিনয় বলে—অপূর্ব গাও তুমি ইরা!

ইরা আজ দেখছে সুবিনয়ের চোখে তার জন্য নীরব অভিনন্দন। ভালো লাগে তার। ইরা ভাবছে সুবিনয়ের কথা।

ইরা যেন মনে মনে কি স্বপ্ন দেখে।

ক্রমশঃ দেখছে ইরা মীরা যেন সুবিনয়বাবুর দিকে একটু বেশী এগোচ্ছে।

সেদিন লিজার পিরিয়ডে মীরা গেছে প্রফেসার সুবিনয় ঘোষের কাছে হিস্ট্রীর নোটপত্র নিয়ে, সুবিনয়বাবুও মীরার আগ্রহ দেখে তাকে ওই সময়েও মোঘল পিরিয়ড সম্বন্ধে বেশ কিছু লেকচারও দেয়।

ইরার কানেও আসে কথাটা।

অন্য মেয়েরাও নজর রাখছে। কারণ সুবিনয়ের উপর চোখ আছে আরও অনেকের।

ইরাও সব শুনেছে। মীরাকে এ নিয়ে কিছু বলেনি। এমনিতে সে চাপা স্বভাবের। তাই নিজেই মনে মনে পথটা ভেবে নিয়েছে।

একটা পথ তাকে নিতেই হবে।

আর কলেজে সে সকলের সামনে কিছুই করবে না। কেউ জানতেও পারবে না ব্যাপারটা।

অবশ্য শুনেছে ইরা প্রফেসর ঘোষ বাড়িতে আরও অন্য প্রফেসারদের মত কোচিং ক্লাশ বসান না। কোন ছাত্র-ছাত্রীকে পড়ান না। এটা তাঁর নীতি-বিরোধী। দরকার হলে কলেজেই বাড়তি স্পেশাল ক্লাস নেন। কলেজেই পড়ান।

তবু ইরা একবার নিজেই চেষ্টা করবে। নিজেই যাবে সে প্রফেসর সুবিনয় ঘোষের বাড়িতে। নিজে গিয়ে অনুরোধ করবে তাঁকে যদি সেখানে পড়বার কোন সুযোগ পায়।

এ কথাটা সে মীরাকেও জানায় না। মীরাও জানার চেষ্টাও করে না। সে তখন ঘরে বাইরে কলেজের ইলেকশন নিয়েই ব্যস্ত। ইলেকশনে তাদের দলকে কি ভাবে জেতানো যায় তারই পরিকল্পনা ছকতে ব্যস্ত।

সুবিনয়ের বাড়িটা শহরের একদিকে। বাড়িতে তার বনমালীই সব। বুড়ো বনমালী এতকাল ধরে রয়েছে এই সংসারে। সুবিনয়কে ছোট থেকে মানুষ করেছে। আজ সুবিনয় প্রফেসরীতে ঢুকেছে, কিন্তু বনমালী তাকে সংসারী করতে পারেনি! সুবিনয় পড়াশোনা, নিজের লেখাপড়ার জগৎ নিয়েই রয়েছে। বিয়ে-থার কথা বললে সুবিনয় হেসেই উড়িয়ে দেয়।

—তুমি থামো তো বনমালীদা—এই চাকরি, তার উপর বিয়ে? আপনি পায় না শঙ্করাকে ডাক। তার শাড়ি গহনা যোগাবো কোত্থেকে?

বনমালী বলে—গরীবের ঘরের মেয়েও তো আছে।

সুবিনয় বলে—মেয়েদের তুমি চেনো না। ঘর-সংসার তো করলে না।

বনমালী বলে—তুমি খুব করেছো! এখন করতে হবে—

সুবিনয় বলে ওকে—একটু চা দাও। পরে ভেবে দেখছি—যাও তো।

এইভাবে চলে সুবিনয়ের সংসারী হবার নাটকটা।

সেদিন বনমালী ইরাকে রিকশা থেকে নেমে এ-বাড়িতে আসতে দেখে খুশী হয়। সুন্দরী—নম্র মেয়েটি।

ইরা শুধোয় বনমালীকে—প্রফেসর ঘোষ আছেন?

বনমালী বলে—ওঘরে আছে—যাও।

সুবিনয় নিজের মনোমত করে লাইব্রেরীটা গড়েছে। তার মাইনের উদ্বৃত্ত টাকাটা এর পিছনেই চলে যায়। বই কেনা তার নেশা। নতুন বইগুলো দেখছে হঠাৎ ইরাকে ঢুকতে দেখে চাইল সুবিনয়।

—তুমি! চিনতে পারে সুবিনয় ওকে।

ইরা প্রণাম করে—আমি ইরা!

ইরা যেন নিজেকে আজ প্রকাশ করতে চায়। সুবিনয়ের চোখে কি বিস্ময়। শুধোয় সে।

—হঠাৎ! এখানে।

ইরা বলে—সামনে পরীক্ষা, পড়াশোনা তো হয়নি তেমন। যদি প্রাইভেট কোচিং একটু দিতেন, সপ্তাহে দু তিনদিন।

সুবিনয় বলে—ওটা তো আমি করি না। নিজের পড়াশোনা—তাছাড়া ওটা ঠিক ভালো লাগে না। তুমি বরং প্রফেসর সোমের কোচিং ক্লাশেই দেখ। ওরাতো ভালোই পড়ান।

বনমালী চা দিতে এসেছে। তার ভালো লাগে মেয়েটিকে। ইরা হতাশই হয়।

বনমালী বলে—ট্যাকা না হয় না নিলে খোকা। তাই বলে একটু দেখিয়ে দিতে এত অসুবিধা কি বাপু? বিদ্যাদান বলে কতা—ওতে পুন্যি হয়।

সুবিনয় বলে—কিন্তু বনমালীদা—

বনমালী বলে—কোনো কিন্তু-টিন্তু নাই, মেয়েটা আশা নে এসেছে, বেশী না পারো সপ্তাহে দুটো দিন দেখাতে হবে। ও যাবে ওই গোয়ালে? ওখানে কি পড়া হয়?

ইরা দেখছে বনমালীকে। বেশ বুঝেছে ইরা, এই বুড়ো লোকটিকে সুবিনয়ও এড়াতে পারে না।

তবু ইরা বলে—না না, যদি, ওঁর অসুবিধা হয়।

বনমালী বলে—অসুবিধা না ঘোড়ার ডিম। তুমি এসো তো—

ইরা এ-বাড়িতে প্রবেশপথ পেয়ে যায় বনমালীর দৌলতে।

ইরা ভাবতেই পারেনি যে এত সহজে সে এখানে প্রবেশপথ পাবে। সুবিনয় ঘোষ তো তাকে ঝেড়ে ফেলে দিতেই চেয়েছিল এক কথায়।

কিন্তু এই বনমালীর জন্যই পারে নি। বিরক্ত হয় সুবিনয়, কিন্তু বনমালীর উপর কথা বলতে পারে নি। তাই ইরা আসার সুযোগ পেয়েছিল এখানে।

ক্রমশঃ ইরার কাছে এই বাড়িটা যেন অতি পরিচিত নিজের মত হয়ে উঠেছে। সকালে পড়তে আসে।

বনমালীও যেন তার পথ চেয়ে থাকে।

চা আনে। বলে—পড়াশোনা ঠিক মত করছো তো দিদি! আমাদের প্রফেসারের শিক্ষার মান রাখতে হবে।

সুবিনয় বলে—তুমি যাও তো!

ইরা মুখ টিপে হাসে।

পড়া সেরে বের হয়ে আসে ইরা।

বারান্দায় বনমালী তার জন্য অপেক্ষা করে॥

ওদিকে লাইব্রেরীতে সুবিনয় ব্যস্ত। ইরা বইপত্র নিয়ে গিয়ে হাজির হয় কিচেনে।

—বনমালীদা মশলা বেটে রেখেছো? আনাজপত্র, মাছ?

বনমালী বাইরের দিকে নজর রাখে। ইরা চটপট মাছের কারি, দু' একপদ শব্জীও রেঁধে দেয়।

দুপুরেও মাঝে মাঝে আসে ইরা এবাড়িতে। ক্লাস সেরে ফেরার পথে। সুবিনয়ের ঘরেরও হাল ফিরেছে। ফুলদানীতে থাকে টাটকা ফুল। বিছানার চাদর, পর্দাও আসে রং মিলিয়ে। লাইব্রেরীর অগোছাল বইগুলোও এখন গোছানো থাকে।

সুবিনয়ও অবাক হয়।

সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে বলে ঃ

—বনমালীদা কাজে মন দিয়েছ দেখছি। সব ছিমছাম, পরিষ্কার।

বনমালী জানে এসব কার কাজ। বলে সে—বনমালী সব পারে গো। আমি তো ছিমছাম থাকতেই চাই। তুমি তো দাও না।

সুবিনয় হাসে।

ইদানীং সুবিনয় সারা বাড়িতে যেন একটা পরিবর্তন দেখেছে।

রান্নারও হাল বদলেছে।

খাওয়ার ব্যাপারে সুবিনয় নিরাসক্ত। যা পেত তাই খেত। তাতে নুন—ঝাল—তেল থাকলো কি থাকলো না খবরও নিত না।

ইদানীং সুবিনয় রান্নায় বেশ পরিবর্তন দেখছে। শব্জী, মাছ, মুরগী রান্নার যে একটা স্বাদ আছে সেটা এখন বুঝছে।

তাই একটু অবাক হয়েই বলে—রান্নাতেও অনেক উন্নতি করেছো বনমালীদা। এ্যাঁ। দারুণ হাত খুলেছে দেখছি।

বনমালী জানে এসব কার রান্না। তবু বলার উপায় নাই, অকপটে বলে—বনমালীর রান্না কি খারাপ ছিল আগে ?

হাসে সুবিনয়—না—না। তবে মুখে তোলা যেত না। গিলে ফেলতাম। এখন তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছি।

বনমালী বলে—রান্নাও শিখেছি গো। হাতই খুলে গেছে। এবার একটি বিরিয়ানী বানাবো দেখবে, চিকেন বিরিয়ানী।

—এ্যাঁ। বল কি বনমালীদা! তাহলে শীগগীরই খাইয়ে দাও। দেখি মোগলাই খানা কেমন বানাও।

বনমালী বিজ্ঞের মত বলে—তাই হবে।

সুবিনয়ও অবাক হয় বনমালীদার এহেন উন্নতিতে। লোকটা এতদিন ধরেও এসব জেনে চুপচাপ ছিল তাহলে!

ব্যাপারটা একদিন সুবিনয় ধরে ফেলে। ইরা এ বাড়িতে কাজকর্ম করছে। বনমালীও খুশি। তার মনে স্বপ্ন জাগে ইরা যদি এ-বাড়িতে আসে সবচেয়ে ভালো হয়।

বনমালীও গল্প করে—বুঝলে ইরাদি, আমাদের গাঁয়ের ভরত বোষ্টম যা কেত্তন গাইতো তুমি তার চেয়েও ভালো গাও।

ইরা গুনগুন করে গাইছে মহাজনী পদ—

—সখী কেমনে ধরিব হিয়া—
আমার বঁধুয়া—আন বাড়ি যায়
আমারই আঙিনা দিয়া—
সখী, বাঁচিব কিসের লাগি
যে বিনে তিলেক পারি না রহিতে
সে হলো পরানুরাগী—

বনমালী ভাবিষ্যুক্ত হয়ে মাথা নাড়ছে, ইরা গাইছে। হঠাৎ এর মধ্যে সুবিনয়কে দেখে চমকে ওঠে ইরা। রান্নাও থেমে যায় তার। সুবিনয় শুনছিল গানটা।

সুবিনয় বলে—এই তোমার পড়া!

তবু বনমালী বলে—সংসারে এসব কাজও শিখতে হয়। ঘরে যাও, চা পাঠাচ্ছি।

সুবিনয় দেখছে ইরাকে। সাজগোছ নেই, মুখের আলগা শ্রী তার রূপযৌবনকে আরও সহজ, সাবলীল করে তুলেছে। রান্নাঘরের গরমে ওর সুন্দর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

ইরা বলে—রাগ করেছেন ?

সুবিনয় দেখছে ওকে।

ইরা বলে—বুনুদা একা এত সব পারে না। ঘর এত অগোছালো, কাগজপত্রের স্তূপ, জানেন দুটো কাঁকড়াবিছেও ছিল। কামড়ালে কি হতো ? তাই—

সুবিনয় চা খাচ্ছে। বলে—তোমার চা!

ইরা বলে—বুনুদার সঙ্গে খাবো।

বৃষ্টি নেমেছে। ইরা ভাবনায় পড়ে—বাড়ি ফিরবো কি করে?

সুবিনয় বলে—বৃষ্টি থামুক।

বৃষ্টি থামতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। জোরে বর্ষণের পর আকাশ মেঘমুক্ত, ঘন নীল। বোধহয় পূর্ণিমার তিথি। বনমালীই বলে—একা যাওয়া ঠিক হবে না, খোকা—

সুবিনয় বলে—বোঝা বইবার মতো গাধা একটাই আছে বুনুদা। বুঝেছি আমার ঘাড়েই চাপাবে।

বনমালী বলে—আমিই যাচ্ছি।

সুবিনয় বলে—অন্ধকারে পড়ে হাত-পা ভাঙ্গলে ভুগতে হবে আমাকেই। তুমি থাকো আমিই পৌঁছে দিই। ঠিক আছে, চলো।

ইরা বলে অভিমান ভরে—থাক। কাউকে দরকার নেই। একাই যাবো।

সুবিনয় বলে—অভিমান! ঠিক আছে।

ফিরছে ইরা সুবিনয়ের সঙ্গে। লেকের কাছাকাছি অঞ্চল। বৃষ্টির পর পূর্ণিমার চাঁদের আলো পড়েছে লেকের জলে। শিউলি-মালতীর সুবাস ওঠে। এক স্বপ্নময় জগৎ। ইরার মনে গুনগুন সুর ওঠে—

—আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে—

সুবিনয় দেখছে ইরাকে। এই মায়াময় রাতে তারা দুজনে দুজনের খুবই নিকটে আসে ওই সুরের মায়ায়। সুবিনয়ও আজ হঠাৎ আবিষ্কার করে জীবনের এক পরম অনুভূতিকে। ইরাও এমনি স্বপ্ন দেখেছিল, সুবিনয়ের হাতখানা ওর হাতে।

ইরা আজ এই বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় লেকের ছায়া-অন্ধকারে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে। আজ সে তৃপ্ত। মনে তার কি খুশীর সুর।

এই আপন-ভোলা মানুষটিকে আজ তার নিজের কাছে পেয়েছে।

সুবিনয়ও অবাক হয়। এতদিন জীবনে সে চিনেছিল শুধু লেখাপড়ার জগৎ-টাকেই। তার বাইরে আর কিছু থাকতে পারে বা আছে তা তার জানা ছিল না।

ইরার এতদিনের নীরব সেবা, আর এই সজল সন্ধ্যায় ইরার নিকট সান্নিধ্য তার মনের অতলে কি এক বিচিত্র সুরের আবেশ আনে।

মনে হয় এতদিন তার মনের অতলে ছিল একটা শূন্যতাই, সেই শূন্যতাই আজ যেন কোন যাদুকাঠির ছোঁয়ায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সুবিনয় ইরাকে বাড়ির কাছে এনে বলে—আজ আসি!

ইরা ওকে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারে না। জানে নানা জনে নানা প্রশ্ন তুলবে। তাই পথ থেকেই বিদায় দেয়।

সুবিনয় যেন অজানতেই বলে—কাল আসছ তো।

ইরা যেন এমনি কিছুই শুনতে চেয়েছিল।

তাই এমনি আহ্বানে সে সাড়া দেয়। বলে—হ্যাঁ।

রাত হয়ে গেছে।

এইবার খেয়াল হয় ইরার।

এতক্ষণ এসব ভাবার সময়, মানসিকতা কোনটাই তার ছিল না। সুবিনয়ের সান্নিধ্য তার সব চিন্তা-ভাবনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

এবার সুবিনয় চলে যেতে এদিক ওদিক চেয়ে বুঝতে পারে রাত্রি হয়েছে।

দোকানপাট সব বন্ধ। কেবল ভজুয়ার পানের দোকানেই আলো জ্বলছে। দুচার জন মাত্র লোক ঘরে ফিরছে।

রাস্তায় লোকজন বিশেষ নেই।

মেয়েটা তখনও ফেরেনি।

মা ঘর-বার করছে। মীরাও দেখেছে কদিন থেকেই ইরার মনে যেন একটা পরিবর্তন এসেছে।

তখন দুজনে একসঙ্গে কলেজে যেত।

এখন ইরা সকালে মাঝে মাঝে কোথায় যায়। জিজ্ঞাসা করলে বলে—এক বন্ধুর বাড়িতে পড়তে যাচ্ছি।

ফেরে বেলায়।

তখন মীরা কলেজে বের হয়ে যায়। আর কলেজ থেকে ফেরার সময়ও ইরা কোন দিন আগেও বের হয়ে যায়। কোনদিন লাইব্রেরীতে পড়ার ভান করে এড়িয়ে থাকে। ফের বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যার মুখে বাড়িতে।

—কোথায় ছিলি ?

মীরার প্রশ্নে ইরা বলে—কেন ? দেখলি তো। লাইব্রেরীতেই ছিলাম। ওখান থেকে বের হয়ে সমিতাদের বাড়িতে এসেছিলাম।

মীরা দেখছে বোনকে। ওর মনে কেমন যেন খুশির ভাব।

আজ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বৃষ্টি নেমেছে। ইরা ফেরেনি। মা ছটফট করছে। কত্তাকে বলতে পারে না। ব্যস্ত মানুষ, এখুনি হৈ চৈ বাধাবে, নাহয় চীৎকার চেঁচামেচি করবে।

কিন্তু বৃষ্টি থামার পরও ইরা ফেরেনি তখনও। মা মীরাকেই শুধোয়—কোথায় গেছে জানিস ? তোকে কিছু বলে গেছে ইরা।

মীরা বলে—কই না তো।

মা গজ গজ করে—কি যে করে। এখন দেখছি মেয়েরাও স্বাধীন হয়ে গেছে। কিছু বলার উপায়ও নেই। সাত কথা শুনিয়ে দেবে। এত রাত হলো—

এমন সময় ইরা হন্তদন্ত হয়ে ফেরে।

মাকে দেখে বলে—বৃষ্টিতে আটকে পড়েছিলাম মা সমিতাদের বাড়িতে।

মা ওকে দেখে ভাবনামুক্ত হয়। তবু বলে—যা খুশী কর তোরা। চল, হাত মুখ ধুয়ে আয়। খেয়ে নিয়ে ছুটি দে আমাকে।

—এতক্ষণ কোথায় ছিলি! পড়াশোনা নেই কোথায় যে যাস!

মীরার কথায় ইরা বলে—তুই ভালো মেয়ে অনার্স পাবি, আমি টেনে-টুনে পাশ করবো, তাই বলে দিন রাত পড়ায় ডুবে থাকতে পারবো না।

মীরা বলে—সুবিনয়বাবুর কাছে নোটপত্র কিছু পেলি ?

—তুই তো পেয়েছিস। সুবিনয়বাবুর পেছনে আর ঘুরিস না মীরা হ্যাংলার মতো। তোর মতলব বুঝেছি।

মীরা দেখছে ইরাকে। ওর কথায় বলে মীরা—ওটা আমার ব্যাপার।

ইরা বলে—না। এখন থেকে ওটা আমার ব্যাপারও। আমরা বিয়ে করছি।

আকাশ থেকে হঠাৎ বাজ পড়লেও এত চমকে উঠতো না মীরা। ইরার কথায় স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

ইরা বলে—আজই ও কথা দিয়েছে। বিয়ে করছি আমরা। তুই পড়াশোনাই কর।

কথাগুলো বলে বের হয়ে যায় ইরা। বিবর্ণ মুখে বসে থাকে মীরা। তার মনে যেন ঝড় উঠেছে। প্রেম জীবনে একবারই আসে। মীরার কুমারী মনে সুবিনয়কে কেন্দ্র করেই নীরব প্রেমের এক স্বপ্ন গড়ে উঠছিল। সুবিনয়ের সঙ্গে সেই নীরব মুহূর্তগুলো আজ শুধু বেদনাদায়ক এক স্মৃতিতেই পরিণত হয়েছে মীরার জীবনে। আর কোনো সঞ্চয়ই তার নেই।

সানাই-এর সুর ওঠে।

মীরা আজ দর্শক মাত্র। তার জীবনে নেমে আসে শূন্যতার বেদনা আর ইরার জীবনে এসেছে পূর্ণতা।

তবু বিয়ে-বাড়ির আনন্দ উৎসবে সামিল হতে হয়েছে মীরাকেও। আজ এই সুবিনয়কে যেন চেনে না মীরা, বরের সাজ। বনমালীই বরকর্তা। মীরাকে আজ ইরা হার মানিয়েছে।

বিয়ের বাসরেও গান গাইতে হয় মীরাকে—সেই সুরে কি বেদনার প্রকাশ ? সুবিনয় দেখছে ওকে। ইরা ও মীরা গাইছে—তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা।

ওই সুরের আড়ালে মীরার কি বেদনাই ফুটে ওঠে।

ইরার নতুন জীবন শুরু হয়েছে তার নতুন ঘরে। সুবিনয় বলে—জানি না ভুল করলে না ঠিক করলে ইরা—আমার মতো একটা বেহিসেবী লোকের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে !

ইরা বলে—হিসেবটা এবার আমাকেই বুঝতে দাও। তুমি নিজেকে এত অপরাধী ভাবছো কেন ?

সুবিনয় বলে—সংসারের চাহিদা যে অনেক ইরা !

ইরা ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—থামো তো ! ওসব পরে ভাবা যাবে।

মীরার চোখের সামনে কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা এমনি ভাবে ঘটে যাবে তা

ভাবেনি মীরা।

মনে মনে সেও অনেক কিছু স্বপ্ন দেখেছিল।

প্রত্যেক মেয়েই সেই স্বপ্ন দেখে কুমারী জীবনে।

একজনকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন!

কিন্তু মীরা ভাবেনি তাকে এইভাবে ঠকতে হবে। হেরে যেতে হবে তার বোনের কাছেই।

তাই এই হার মেনে মীরার মত বেপরোয়া মেয়েও কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেছল।

ইরার সেই সন্ধ্যার কথাগুলো আজও ভোলেনি মীরা। তার অগোচরে, তাকে লুকিয়ে ইরা যে সুবিনয়বাবুর জীবনে এমনি করে নিজের আসন কায়েম করেছিল সেটা জানতেও পারেনি।

পুরুষ জাতটাই যেন এমনি এক রহস্য-ঘেরা জাত। সুবিনয়ও মীরাকে কিছু জানায় নি। ইরাকেই মেনে নিয়েছে নীরবে।

মীরার সেখানে আর করার কিছুই নেই। তাই সব কিছুই দেখতে হয়েছে মীরাকে নীরব দর্শকের মত। শুধু দেখতেই নয়, তাকে সব অনুষ্ঠানে মদত দিতে হয়েছে।

কারণ বাবার শরীর ভালো নেই। মা একা কি করবে।

মীরাকে মেয়ে হয়েও এই বাড়ির ছেলের ভূমিকা নিয়ে ইরার বিয়ের সব উদ্যোগ আয়োজন করতে হয়েছে।

ইরা এখন নিজের ঘরে চলে গেছে।

এ বাড়িতে রয়ে গেছে মীরা একা।

বি-এ পরীক্ষার ফলও বের হয়েছে। মীরা ভালোভাবেই পাশ করেছে। ইরাও!

কিন্তু ইরা এখন শান্তিতে ঘর-সংসার করছে।

মীরা অবশ্য যায় মাঝে মাঝে।

আজ ইরার মনে মীরার জন্য কোন হিংসা নেই। বরং মীরার নিঃসঙ্গতার জন্য ইরা এখন বেদনাই বোধ করে। শুধোয় ইরা,—এম-এটা পড় দিদি?

মীরা কি ভাবছে। এর মধ্যে সে চাকরীর চেষ্টাই করছে। কলকাতায়, বাইরেও দু এক জায়গায় দরখাস্ত করেছে।

বৈকালে কোন নামী কমার্শিয়াল কলেজে স্টেনো টাইপিস্টের ক্লাসও করছে।

মীরা বলে—এম. এ! ওর চেয়ে ভাবছি তেমন চাকরী পেলে করবো!

—মানে? অবাক হয় ইরা।

মীরার মনের বেদনাটা তার কথার সুরে ঝরে পড়ে। বলে ইরা—সেকি রে!

মীরা বলে—তাই রে। বাবারও শরীর খারাপ। রিটায়ার করেছেন। আর কেন তাঁদের বোঝা বাড়াই। তাই চাকরীই খুঁজছি। একটা চান্সও এসেছে।

ইরা দেখছে ওকে। শুধোয়।

—কোথায়?

—দূরে। বোম্বাই এর কোন অফিস থেকে। এখানে ওদের একটা ব্রাঞ্চ আছে। তারাই ডেকেছিল। ওরা বলে এখানে নয়, ওদের বোম্বাই অফিসে যেতে হবে। ভাবছি চলেই যাবো। তবু স্বাধীনভাবে বাঁচা যাবে। কলকাতা আর ভালো লাগছে না রে।

ইরা অবাক হয়।

আজ মনে পড়ে তার নিজের কথা। মীরাকে সেই-ই ঠকিয়েছে। তাই মীরা সেই দুঃখটাকে আজও ভোলেনি।

ইরা বলে—তুই আমার উপর রাগ করেছিস, না রে দিদি!

মীরার মনে আজ কোন অভিযোগই নেই। সে ওসব ব্যাপার সহজ ভাবেই নিয়েছে। তাই বোনের কথাই বলে—পাগলী! না-না। ওসব কোনদিন কিছু ছিলই না। এটা ছিল জাস্ট এ স্পোর্টস্! খেলা। এ নিয়ে তুই এখনও দেখছি সিরিয়াসলি ভাবছিস? তোর উপর রাগ করবো কেন?

—তবে বিয়ে-থার কথাও ভাবছিস না? একেবারে কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে চাইছিস!

মীরা হাসে—জীবনটাই এক স্পোর্টস ইরা। সবকিছু এখানে গতানুগতিক ছকে চলে না। তাই যা ঘটে সবকিছু সহজভাবেই মেনে নিতে হয় রে। নাহলে অশান্তিই বাড়ে। কেন, চাকরী কি দোষের? ভালো চাকরী হলে কেন নেব না? মাকেও জানাবো খবরটা!

কলকাতার জীবন যেন বিষিয়ে উঠেছে তার কাছে। এখান থেকে সরে যাবার চেষ্টাই করছে। মাকে বলার কথা ভাবে সে।

মা বলে—কি এত ভাবিস মীরা?

মীরা এড়াবার জন্য বলে—চাকরির কথাই ভাবছি মা। ভালো চাকরি, মাইনেও ভালো। তাই ভাবছি নিয়ে নিই চাকরিটা। হোক না বোম্বাই।

মা দেখছে ওকে। বলে—আমার শরীর ভালো নেই, তুইও চাকরি নিয়ে এতদূরে যাবি? ইরাও তার ঘরে চলে গেল? কি যে তোর হয় বুঝি না বাছা। চলে যাবি এখান থেকে দূরে?

মীরা বলে—দূর কি মা! কোম্পানি প্লেনের ভাড়াই দেবে। মাত্তর দুঘণ্টার পথ। তাই তাদের জানিয়ে দিয়েছি যাবো।

বোম্বাই যাবার আগে মীরা সেদিন এসেছে ইরার বাড়িতে। ছোট্ট বাড়িটাকে—রগুলোকে ইরা সুন্দর করে সাজিয়েছে। আজ ইরাও বদলে গেছে। মা হতে চলেছে সে। একটা ছোট্ট সোয়েটার বুনছে। সুবিনয় বলে—এখন সাবধানে থাকো ইরা!

ইরা সুবিনয়কে কাছে টেনে নিয়ে ওর বুকে মাথা রেখে বলে—এত ভাবনা কেন গো?

হঠাৎ মীরাকে দেখে চাইল।

সরে যায় সুবিনয়। মীরাও ওদের এই নিভৃত মুহূর্তে এসে পড়েছে যেন অনাহূতের মতোই। সুবিনয় বলে—এসো, এসো মীরা।

ইরা জানায়—আয়। বোস।

মীরা বলে—বেশী সময় নেই রে। চলে যাচ্ছি দূরে। তাই দেখা করতে এলাম।

সুবিনয় চাইল—কোথায় চললে ?

মীরা বলে—বোম্বাইএ একটা বড় ফার্মে কাজ পেলাম। খুব ভালো চাকরি, মডেলিংও করা যাবে। ওখানেই চলে যাচ্ছি। কাল মর্নিং ফ্লাইটে।

সুবিনয় বলে—তাই নাকি !

ওর কলেজের দেরী হচ্ছে। ইরা বলে—কলেজে যাবে না ?

সুবিনয়ের খেয়াল হয়। বলে সে—হ্যাঁ। এখন চলি মীরা, ইরার শরীরটা ভালো নেই। ও যেতে না পারলে আমি এয়ারপোর্টে যাবো। পরে দেখা হবে।

সুবিনয় চলে গেল। মীরা দেখছে ইরাকে। শুধোয় মীরা—তোর শরীর খারাপ ?

ইরা সলজ্জ হেসে বলে—ও কিছু না।

—ওটা কি বুনছিস। এইটুকু সোয়েটার—মীরা এবার যেন বুঝতে পেরে বোনকে জড়িয়ে ধরে—এ্যাই হতভাগী, এত বড় সুখবরটা জানাস নি ! লজ্জা— !

ইরা বলে—তুই আমার উপর রাগ করে আছিস, না রে !

—কেন ? অবাক হবার ভান করে মীরা।

ইরা বলে—সুবিনয়কে তোর কাছ থেকে আমিই সরিয়ে নিয়েছি—তাই চলে যাচ্ছিস দূরে।

মীরা অন্তরের বেদনা চেপে বলে—পাগলী ! নারে—ওকে তুই সুখী করতে পারবি, নিজে সুখী হবি এই দেখেই আজ খুব খুশি হয়েছি রে ! এ বোধহয় আমি পারতুম না। তোরা সুখী হ—তবু মাঝে মাঝে তোদের সুখের সংসারে দুদিনের অতিথি হয়ে এসে সুখী হবো। আর চাকরিটা ভালো—তাই বোম্বাইএ যাচ্ছি। দেখা যাক জীবনের স্রোত কোন্ ঘাটে নিয়ে যায় আমাকে। তোরা সুখী হ ইরা—

ইরা দেখছে নতুন এক মীরাকে।

মীরা গিয়ে পৌঁচেছে এক নতুন জগতে।

নতুন শহর বোম্বাই, বিরাট এয়ারপোর্ট। মীরা লাউঞ্জে দেখে একটি তরুণ,

হাতে একটি বোর্ড—তাতে লেখা ওয়েটিং ফর মিস্ মীরা রায়, ক্যালকাটা।

নিজের নাম দেখে মীরা এগিয়ে আগে। ভদ্রলোক ওর দিকে চেয়ে শুধোয়—আপনি মিস্ রায়?

মীরা জানাতে ভদ্রলোক বলে—আমি মিঃ লাল, ইউনিক এক্সপোর্ট ইমপোর্ট থেকে আসছি। ওয়েলকাম টু বম্বে।

মীরার হাত থেকে লাগেজ টিকিটটা নিয়ে মিঃ লাল নিজে গিয়ে হাজির হয় লাগেজ শেডে। তখন প্লেন থেকে নামিয়ে আনা যাত্রীদের মাল-সুটকেস-গুলো কনভেয়ার বেল্টে সারবন্দী হয়ে আসছে, রকমারি লাগেজ। মীরাই দেখায়—ওইটা।

মিঃ লাল ভারি সুটকেসটা তুলে নেয়। মীরা বলে কুণ্ঠিত স্বরে—আমি নিচ্ছি!

মিঃ লাল বলে—নো প্রবলেম। চলুন।

এয়ারপোর্টের বাইরে গাড়ির সার। ওরা এসে গাড়িতে উঠলো। মিঃ লাল নিজেই গাড়ি চালাচ্ছে।

ঝকঝকে শহর, প্রশস্ত মসৃণ গতিতে গাড়ি ছুটে চলেছে। সামনে সমুদ্রের ধারে বান্দ্রার পাহাড়সীমা, গায়ে গায়ে বিশাল আকাশ-ছোঁয়া বড় বড় দশ বারো তলা বাড়ি।

মিঃ লাল বলে—আপনার জন্য কোম্পানি ফ্ল্যাট রেখেছে এইখানে। অবশ্য আপনার অফিস একটু দূরে। শহরের মধ্যে।

—আপনার?

মীরার কথায় মিঃ লাল বলে—আমি কোম্পানির পাবলিসিটি অফিসার। আমার অফিস শহরেই, তবে অন্য বিলডিংএ।

মীরার ফ্ল্যাটটা ভালোই লাগে। সমুদ্রের ধারেই আট তলা বাড়ির ছতলায় সাজানো ফ্ল্যাট, ফোনও রয়েছে। জানলা থেকে দেখা যায় আরব সমুদ্রের বিস্তার।

মিঃ লাল বলে—আপনার কাজের জন্য একটি মারাঠি মেয়ের কথা বলে রেখেছি। আমার ওখানে যে কাজ করে তারই গ্রামের মেয়ে।

মীরা তার কাজের মেয়েটিকে দেখছে। বয়স্কা মহিলা। কাছা দিয়ে মারাঠী ঢং-এ শাড়িটা পরা।

মিঃ লাল বলে—এ সব কাজই করবে। বাজারপত্রও। আর দরকার হলে আমাকে ফোন করবেন।

ফোন নাম্বারটা দিয়ে যান মিঃ লাল।

—এখন চলি। রেস্ট নিন। কাল আমিই অফিসে পৌঁছে দেব, রেডি থাকবেন। নাইন্থ এ্যাট নাইন।

বোম্বাই শহরে এসে প্রথম দিনটা কেমন বিচিত্র বোধহয় মীরার।

বিশাল শহর। পথে দেখেছে আসার সময় মীরা শহরের কর্মব্যস্ততা। একটা দিন তার বিশ্রাম।

মারাঠী মেয়েটি তবু কিছু ভাঙ্গা হিন্দী বোঝে এই রক্ষে, বেশ শান্ত, নম্র। তবে রান্নার হাল দেখে হাসি পায়। মীরা প্রথমদিনেই ওকে রান্নার তালিম দিতে শুরু করে। বাজারপত্র এনেছে।

মীরার দুপুরে নিঃসঙ্গতাটা যেন বোঝা হয়ে ওঠে। ফ্ল্যাটটা খালি। কোম্পানী মোটামুটি ফার্নিচার, একটা কালার টি. ভি.ও রেখেছে।

সাততলার উপর থেকে নীচে চেয়ে দেখে, পথটা সমুদ্রের ধার বরাবর হাঁসুলী বাঁকের মত বেঁকে গেছে। গোল হয়ে একদিকে এসে ছুঁয়েছে সমুদ্র।

রাস্তার ধারে ছোট বড় সাজানো বাংলো। নারকেল গাছের মাথাগুলো অনেক নীচে। ঝড়ো হাওয়ার মাতন নারকেলের পাতায়।

সমুদ্রে বোধহয় জোয়ার এসেছে।

একটু আগে দেখেছিল ভাঁটার সময় মাঝে মাঝে পাথর মাথা তুলে আছে।

এখন জোয়ারের জলে সব ডুবে গেছে।

দু'একটা মাছ ধরার নৌকাকে দেখা যায় পাল তুলে দূর সমুদ্রের দিকে চলেছে।

মীরার মনে হয় সেও যেন অমনি নির্জন সমুদ্রের বুকে কোন হারানো নৌকার মতই। কোন্ জগৎ থেকে ভাসতে ভাসতে এসে এখানে ঠেকেছে।

এই শহরেই তাকে পায়ের তলে মাটি পেতে হবে ; মীরার মধ্যে তাই যেন একটা কঠিন সত্তা জেগে ওঠে।

মানুষ বিপদে পড়লে তার ইন্দ্রিয়গুলো মায় দেহের পেশী অবধি আরও বেশী মাত্রায় সজাগ, সক্রিয় হয়ে ওঠে।

জীবনের এই ধর্ম।

মীরাও তাই মনে মনে তৈরী হয়ে উঠেছে। সেই জেদী বেপরোয়া মেয়েটি এবার আর জীবনযুদ্ধে হার মানবে না।

প্রথম দিন মীরা অফিসে এসে একটু অবাক হয়। বিরাট প্রতিষ্ঠান। একটা বিশাল ফ্লোর জুড়ে বিভিন্ন সেকশন। সারা হল-এ সারবন্দী চেয়ার ঝকঝকে টেবিল, র‍্যাক-টাইপমেশিন, লেটেস্ট মডেলের ইলেকট্রনিক টাইপরাইটার, টেলেক্স বসানো।

উপরের ফ্লোরেও আরও কিছু বিভাগ আর সারবন্দী সুন্দর চেম্বার। তার উপরের ফ্লোরটা কিছুটা নীরব। মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা। ওদিকে কনফারেন্স হল, এপাশে ডিরেকটার্স, আর চিফ একাউন্টেন্টের চেম্বার। আরও দু'একটা চেম্বার।

মীরা এসেছে প্রথম দিন।

ডিরেকটার মিঃ সাহানীর চেম্বারে দেখা করতে। মিঃ সাহানী সারা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। ওখানেই ছিল মিঃ দাশানী, চিফ এগ্‌জিকিউটিভ আর ডিকস্টাও।

সেন্ট্রালি এয়ারকনডিশনড বিল্ডিং, বিশাল টেবিলের এপাশে কয়েকটা চেয়ার।

মীরা তার একটায় বসেছে। মেজেতে পুরু নরম কার্পেট পাতা।

মীরাকে দেখছে ওরা।

মিঃ দাশানী এই প্রতিষ্ঠানের চিফ এগজিকিউটিভ। শীর্ণ চেহারা—টিকালো নাক—চোখদুটোতে যেন তীব্রসন্ধানী চাহনি। সে তুলনায় ডিকস্টার চেহারা পেটা মজবুত। হাতগুলো রোমশ—তেমনি নিটোল স্বাস্থ্য। কেমন নিষ্ঠুর দেখতে।

মিঃ সাহানীর অনেক ব্যবসা, বিভিন্ন জায়গা থেকে সেগুলো চলে। শহরে দু-তিনটে হোটেলও আছে, গোয়া মাদ্রাজেও হোটেল চলে। সবই প্রায় ফাইভস্টার হোটেল।

মিঃ দাশানী দেখছে মীরাকে।

সুন্দরীই, চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ, মুখে কমনীয়তা। ঠিক এখানে যে ধরনের উগ্র সৌন্দর্য দেখা যায়, এর সৌন্দর্য তেমনি চোখ ধাঁধানো, উৎকট নয়। শান্ত—অনেক শ্রীময়ী।

মীরা এয়ারকন্ডিশনড্ চেম্বারের দামী ফোমের বড় চেয়ারের গভীরে যেন হারিয়ে গেছে।

মিঃ দাশানী বলে—মন দিয়ে কাজকর্ম করুন মিস্ রায়। আমরা কাজের লোকের যোগ্য দাম দিই। আশা করবো কোম্পানি আপনার সবরকম সাহায্য, সহযোগিতা পাবে।

মীরা বলে—নিশ্চয়ই মিঃ দাশানী।

মিঃ দাশানী বলে—এনি প্রবলেম কাম টু মি।

মীরা নিজের চেম্বারে এসে বসে এবার। তার কাজও বুঝে নেবার চেষ্টা করে।

আর দু'একজন অধস্তন কর্মচারীদের কাছে কাজের হিসাব শুনে মনে হয় ফাইলে সই করা ছাড়া আর তেমন কিছু করণীয় নেই তার। আর কিছু পার্টি এলে তাদের সঙ্গে কথা বলা—তাদের বক্তব্য শুনে বিভাগীয় প্রধানদের কাছে পাঠানো। এই কাজের জন্যই কোম্পানি তাকে মোটা মাইনে, গাড়ি ফ্ল্যাট সবই দিচ্ছে। মনে মনে খুশি হয় মীরা।

বৈকাল নামছে, হঠাৎ ফোনটা বেজে ওঠে।

—মিঃ লাল বলছি। ফিরবেন তো!

মীরা খুশি হয়। বলে—হ্যাঁ!

মিঃ লাল বলে—অফিসেই থাকুন, পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যে যাচ্ছি।

…সন্ধ্যার পর বোম্বাই-এর রূপই বদলে যায়। পাহাড় আর সমুদ্র নিয়ে বোম্বাই। মেরিন ড্রাইভের বিশাল প্রাসাদগুলোর আলো পড়ে সমুদ্রের বুকে, উঠে গেছে রাস্তাটা—দূরে দূরে আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি—রাস্তার আলো—যেন বিদেশের কোনো শহরই।

সমুদ্রের ধারে বড় হোটেল—সামনে সাজানো ফুলের গাছ, দেশী বিদেশী গাড়ি,

এদেশী ভিনদেশী লোকজন, স্বল্পবাসা মেয়েদের আনাগোনা। সবাই যেন প্রাণোচ্ছল।

মীরা দেখছে এই জীবনকে। শুধোয়—এখানে? কি ব্যাপার?

মিঃ লাল বলে—এই সমাজেই থাকতে হবে, এ জীবনকে দেখবেন না? চলুন।

বিচিত্র জীবন। ঐশ্বর্যের নগ্নপ্রকাশ, যৌবন রূপের বেসাতির বাজার।

বড় হল-ঘরের আলোগুলো কায়দা করে ম্লান করা হয়েছে যাতে সারা হল-ঘরের আলোআঁধারির পরিবেশ গড়ে ওঠে। সেখানে নাচ গান চলেছে, ডায়াসে একটি মেয়ে যৌবনের হাট মেলে তার দেহ-বুক নাচিয়ে গেয়ে চলেছে। সেই গানের সঙ্গে নাচছে হলে মেয়ে-পুরুষের দল। প্রকাশ্য এই উন্মাদনার নেশাকে দেখছে মীরা।

একটু ঘাবড়ে গেছে সে। এই জীবনকে আগে দেখেনি।

মিঃ লাল আর সে বের হয়ে আসে ওই পরিবেশ থেকে।

ওদিকের অন্য হলে চলেছে কোনো দামী কোম্পানির ফ্যাশন প্যারেড। তাদের কাপড় মিলের তৈরি নানা ধরনের শাড়ি-সার্টিং-সুটিং-এর প্রদর্শনী। সুন্দরী মেয়েরা নানা ধরনের শাড়ি পরে প্রদর্শনীমঞ্চে উঠে প্রজাপতির মতো পাখনা মেলে চলেছে দর্শকদের সামনে।

—হাই! হঠাৎ কার ডাকে চাইল মিঃ লাল।

—তুমি! মিঃ রায়না!

মিঃ লালই পরিচয় করিয়ে দেয়—রায়না, আমার নতুন বন্ধু মিস্ রায়। কলকাতার মেয়ে।

রায়না দেখছে মীরাকে—গ্লাড টু মিট ইউ! ফ্রম ক্যালকাটা? বেঙ্গলী?

—হ্যাঁ! মাথা নাড়ে মীরা।

মিঃ রায়না দেখছে মীরাকে। শাড়ি পরা ওই সুন্দরী-সুগঠিতা মীরাকে দেখছে সে নিপুণ শিল্পীর দৃষ্টিকোণ থেকে। বলে রায়না—চার্মিং!

হঠাৎ কি ভেবে রায়না বলে—লাল! জাস্ট এ মিনিট।

লালকে নিয়ে রায়না ওদিকে চলে গেল। একটু পরে ফিরে আসে লাল।

মিঃ রায় ও মীরা ফিরছে গাড়িতে। রাতের বোম্বাই-এর পথে লোকচলাচল কমলেও গাড়ির ভিড় কমেনি।

মিঃ লাল বলে—রায়না এখন টপ পাবলিসিটি বস্। মডেলিং-এর নাম্বার ওয়ান ডিলার। কি বলছিল জানেন?

মীরা চাইল ওর দিকে।

মিঃ লাল বলে—অফার দিয়েছে আপনাকে, শাড়ির মডেলিং করলে পার্ মডেলের জন্য আপনাকে দুহাজার টাকা অবধি দিতে পারে। একবার স্টেজে যাবেন, দুমিনিটে দু'হাজার। আর বিজ্ঞাপনের মডেলিং-এর জন্য রেট আরও বেশি। জাস্ট ফিউ ফটোগ্রাফ নেবে তারা। সেগুলোকে প্রচারের কাজে লাগাবে।

মীরা অবাক হয়—সেকি! এত টাকা!

মিঃ লাল বলে—এ তাদের অফার। একটা বিজ্ঞাপনে ক্লিক করলে তখন আপনিই

টার্মস ডিকটেট করতে পারবেন। দেখুন ভেবে—পার্ট টাইমে যদি রোজগার করতে চান। ফি মাসে কয়েক হাজার টাকা—তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

মীরা কি ভাবছে? বোম্বাই-এর আকাশে যেন টাকা উড়ে বেড়াচ্ছে একটা উপরতলার সমাজে, ধরে নিয়ে নিজের আখের গোছানো যায় অনায়াসেই। এ এক বিচিত্র জগৎ—দেহ যৌবনের দামই এখানে অনেক বেশি।

মিঃ লালই সেদিন মীরাকে সমুদ্রের বুকে গজিয়ে ওঠা বড় হোটেলে ডিনার খাওয়ায়।

সমুদ্রের খাড়ি বুজিয়ে এখন বোম্বাই শহর যেন দখল জুড়েছে। এই হোটেলও সেই জবরদখলের জায়গায় মাথা তুলেছে। হোটেলের নীচেই সমুদ্রের জল এসে আছড়ে পড়ে।

ঝকঝক করছে আলোয় বন্যায়।

বিরাট লাউঞ্জে দিশী-বিদেশী-আরবমুলুকের শেখদের আনাগোনা। বড় বড় গাড়ির যেন শোভাযাত্রা এসে থেমেছে হোটেলে।

লিফটে করে উঠে গেল তারা পনেরো তলার উপরের রেস্তোরাঁয়।

মিঃ লাল এখানের মনে হয় নিয়মিত খদ্দের।

দামী উর্দিপরা বেয়ারারাও সেলাম করে তাকে। এগিয়ে আসে ওয়েটার।

জানলার ধারে টেবিলের চেয়ার টেনে দেয় ওদের বসার জন্য। সোনার জলে লেখা মরোক্কো চামড়ার বাঁধাই ঢাউস মেনু কার্ড খুলে ধরে।

—কি খাবেন?

শুধোয় মিঃ লাল মীরাকে।

খাদ্যের লিস্টও বিরাট এবং বিচিত্র। আর খাদ্যের নামও প্রায় অধিকাংশই অজানা।

মীরা বলে—যা হোক লাইট কিছু হলেই হবে।

ড্রিংকস্। এনি ড্রিংকস্!

অর্থাৎ পানীয়ও দরকার। মীরা হুইস্কি খায়নি। খেতেও চায় না। ওর নীরবতা দেখে মিঃ লাল বুঝেছে ব্যাপারটা।

বলে সে, মেমসাব্ কো লিয়ে অরেঞ্জ জুস—মেরেকো লিয়ে ওয়ান পেগ স্কচ—অন্ রকস্।

বেয়ারা পানীয় আনে। 'অন্ রকস্' এর ব্যাপারটা জানতো না মীরা।

দেখে বেয়ারা সোনালী পানীয় এনেছে মাত্র কয়েকটা বরফ দিয়ে সুন্দর পানপাত্রে। রকস্ এখানে পাথর নয়, বরফই।

···হঠাৎ খেয়াল হয় এতক্ষণ এদিকে দেখছিল চাঁদনী রাতের মায়াময় সমুদ্র গিয়ে দিগন্ত রেখায় মিশেছে। হঠাৎ এবার বাইরে চাইতে দেখে সমুদ্র যেন স্বপ্নের মত হারিয়ে গেছে!

দেখা যায় সারবন্দী আকাশ ছোঁয়া বাড়ি। তাতে আলোর বিন্দুর ভিড়।

রাস্তায় গাড়ির সারি চলেছে হেডলাইট জেবলে। লোকজনের ভিড়!

অবাক হয় সে!

—সমুদ্র কোথায় গেল?

—মিঃ লাল হেসে ওঠে।

—তোমাকে বলা হয় নি ম্যাডাম্—এই পুরো রেস্তোরাঁটার ফ্লোরটাই 'রোটেটিং' অর্থাৎ ঘূর্ণায়মান। খুবই ধীরে ধীরে ঘুরছে তাই ঘোরাটা বুঝতে পারছ না।

তখন ছিলাম সমুদ্রের দিকে। এখন ঘুরে এসেছি শহরের দিকে, একটু পরেই আবার সমুদ্রের দিকেই চলে যাবো।

—তাই নাকি? অবাক হয় মীরা।

খাবার এসে গেছে। সবই বেশ গরম। আর স্বাদও অন্যরকমের।

অবশ্য মিঃ লালকে বিল দিতে দেখে অবাক হয়। দুজনের এখানে খাবার জন্য খর্চা হয়েছে প্রায় সাড়ে পাঁচশো টাকা। আর এটা যেন কিছুই নয় লালের কাছে।

ফ্ল্যাটে ফিরে আসে মীরা তখন রাত্রি প্রায় একটা। অবাক হয় সে। বোম্বাই-এর জীবনে রাত একটা যেন তেমন কিছু দেরী নয়। এ শহর যেন ঘুমোয় না।

ওই রাত্রে দেখেছে মীরা শহরের পথে লোকজন অনেকেই চলাফেরা করছে। গাড়ির ভিড়ও কম নয়। ট্যাক্সিও যত্রতত্র মেলে। দোকানও বেশকিছু খোলা আছে।

ক্লান্তি নামে মীরার শরীবে।

প্রথমদিনই বোম্বাই-এর জীবনযাত্রার বেশ কিছুটা দেখেছে।

আর মনে হয়েছে কলকাতার তুলনায় এ শহব আরও অনেক এগিয়ে আছে। এখানে প্রাচুর্য আছে। তাই বিলাস-ব্যসনেব সাডাও বেশী! জোয়াব এসেছে সমুদ্রে।

শান্ত রাত্রির স্তব্ধতার মাঝে জেগে আছে সমুদ্রের কলকল্লোল আর হাওয়ার মত্ততা। এখানের আকাশ-বাতাসেও যেন সেই মত্ততা আব ডাগর যৌবনের প্রভাব মিশিয়ে আছে ওতপ্রোত ভাবে।

এমনি এক বিচিত্র জীবনে এসে পড়েছে মীরা। তাকেও এই দুরন্তজীবনেব গতির মাত্রায় সামিল হতে হবে।

ইরার জীবনে এসেছে মাতৃত্বের পূর্ণতা।

কয়েক বছরে ইরার জীবনে এনেছে আমূল পরিবর্তন। তার দেহে মনে এই

ক'বছরের পরিবর্তন তাকে যেন অন্য এক ইরায় পরিণত করেছে।

বনমালীরও বয়স বেড়েছে।

আর বেড়েছে কাজের চাপও। শুভা আর বিমু, সুবিনয়ের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বনমালী এখন ব্যস্ত। ইরাও।

সকালে তাদের ব্রেকফাস্ট খাইয়ে পোশাক পরিয়ে স্কুলে পাঠাতে হয়। ইরার সময় নেই। খাবার তৈরী, বাজারপত্র সামলানো—যেন ক্লান্তি বোধ করে সে। স্কুলে যাবার রিকশাও আসেনি।

বিমু বলে—হেঁটে যেতে হবে?

শুভা বড়, সে বলে—এইটুকু পথ, দাদুর সঙ্গে হেঁটেই যাবো।

বিমু রাজী নয়।

ইরা ধমকে ওঠে।—যাও বলছি!

বনমালী বলে—ধমক দিও না বৌমা। আমি নিয়ে যাচ্ছি।

দেখা যায়, সোমের ছেলেমেয়েরা গাড়িতে করে স্কুলে যাচ্ছে।

বিমু বলে—আমি গাড়িতে যাবো। বাদলদারা গাড়িতে যায়।

ইরা চাইল ছেলের দিকে কঠিন চাহনিতে।

ছেলেদের মনে এই অতৃপ্তির সুর ইরাকে যেন ভাবিত করে তোলে।

মাকে চাইতে দেখে। বিমু চলে গেল ভয়ে বনমালীর সঙ্গে হেঁটেই।

ইরার মনে পড়ে সেইদিনের কথা। সেই প্রথম যৌবনের প্রেম প্রতিদিনের গ্লানিতে যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। তবু ইরা আজকেও সব মেনে নিতে চেষ্টা করে মনের অতৃপ্তি অপূর্ণতাকে ঢেকে।

সুবিনয় এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। তার নতুন লেখা নিয়ে ব্যস্ত। ইরা চা নিয়ে ঢুকতে সুবিনয় বলে—এবার বোম্বে ইউনিভার্সিটির লেকচার চালুক্য সাতবাহন সাম্রাজ্যের উপর দিচ্ছি—তাদের শিল্পশৈলী—

স্ত্রীর দিকে চেয়ে চুপ করে যায় সুবিনয়—কি হলো?

ইরা জবাব দেয় না।

সুবিনয় বলে—ওরা স্কুলে গেছে?

ইরা বলে—হ্যাঁ। রিকশা আসেনি, হেঁটেই গেল।

ইরা শোনায়—প্রফেসর সোমের ছেলেরা গাড়িতে যাতায়াত করে, একটা পুরোনো গাড়ি হলে—ভালোই হতো।

হাসে সুবিনয়, বলে—নিজের এত কাজ, তার জন্য একটা কাজের লোকের কথা তো বলো না; ছেলেমেয়েদের জন্য গাড়ির কথা বলো। ঠিক আছে, এবার কোচিং ক্লাসই খুলবো। আর দু' একজন জানাশোনা পাবলিশার তাদের ফরমাস মতো নোট লিখতে বলেছে—টাকাও দেবে। তাই করবো। আর বলো তো

শশীবাবুর সঙ্গে কনট্রাকটারির কাজেই নামি। চুরি করতে পারলে অনেক পয়সা—

ইরা বলে—তাই বলেছি নাকি!

সুবিনয় বলে—বলোনি। বলতে পারবে না তাও জানি। কিন্তু সবই দেখি, বুঝি। কত কষ্টে তুমি সংসার চালাও তাও জানি। এক এক সময় মনে হয় আদর্শ শিক্ষকতা, কর্মনিষ্ঠা—লেখাপড়াই সব নয়, কলেজের মাপা মাইনেতে আজ সংসার চলে না—তাই—

ইরা বলে—না। ওসব তুমি করবে না।

চাইল সুবিনয় ওর দিকে।

ইরা বলে—যেমন করে হোক সংসার চালিয়ে নেব। ভাবছি পাড়ার স্কুলের চাকরিই নেব। তবু কিছুটা সাশ্রয় হবে সংসারের।

—কি বলছো ইরা?

ইরা বলে—এ নিয়ে তুমি ভেবো না। তুমি যা করছো করো। তোমার কাজ করে যাও।

হঠাৎ বেলটা বাজে—ইরা দরজা খুলতে ঢুকছে একটি মেয়ে। তরুণীই, শান্ত সুন্দর সংযত বেশবাস। এসে প্রণাম করে সুবিনয়কে—চিনতে পারছেন স্যার?

সুবিনয়ের খেয়াল হয়—ঊর্মিলা। হ্যাঁ-হ্যাঁ—কলেজে তোমার এপয়েন্টমেন্টের কথা শুনেছিলাম।

ঊর্মিলা প্রণাম করে ইরাকে—বৌদি!

ইরা ওকে কাছে টেনে নেয়—থাক থাক, বসো ভাই।

ঊর্মি বলে—এখানেই এলাম আপনারা আছেন জেনে।

ইরা বলে—বেশ করেছো। উঠেছো কোথায়?

ঊর্মি বলে—আপাততঃ গার্লস হোস্টেলে উঠছি। একটা বাসার দরকার।

সুবিনয় বলে—ছাত্রদের বলছি খোঁজখবর নিতে, না হয় সুরপতিবাবুর বাড়িতে খালি আছে, হয়ে যাবে।

ইরা বলে—আজ খেয়ে নাও এখানে। উনিও কলেজে যাবেন।

ঊর্মি বলে—আবার হাঙ্গামা করবেন!

হাসে ইরা—হাঙ্গামা কি ভাই।

সুবিনয় বলে—তাই করো। কলেজে আমাকেও যেতে হবে—তোমাকেও নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেব সকলের সঙ্গে।

প্রফেসর সোম তখন কোচিং ক্লাসে লেকচার দিচ্ছে, বেশ কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে।

প্রফেসর সোম এই শহরের পুরোনো বাসিন্দা। ওর বাবা ছিলেন এখানের স্কুলের সামান্য শিক্ষক। সোম তাই দেখেছে শিক্ষকতা করে বাবার দুঃখ ঘোচেনি।

নিজে পড়াশোনায় মোটামুটি ভালো ছিল। বাবার চেষ্টায় কলেজেও ভর্তি হয়েছিল। টিউশুনি করে নিজের পড়ার খরচ যুগিয়ে সংসারেও সাহায্য করেছে। কোনমতে দিন কেটেছে।

এম. এ. পাশ করার পর শহরেই ফিরে আসে।

তখন সবে নতুন কলেজ গড়ে উঠছে। সোম তখন আধা মাইনেতেই এখানে ঢোকে।

থিসিসও করেনি। ডক্টরেট ডিগ্রীও নেই। তবু দরিদ্র শিক্ষক বাবার চেষ্টায় অধ্যাপনার কাজ পেয়ে গেল। নিজের শহরের সদ্য গজিয়ে ওঠা কলেজে। কলেজে চাকরী পাবার আগে সামান্য ঠিকাদারীর কাজ করতো। ইরিগেশন পি-ডবলু-ডির রাস্তা, ছোটখাট বাড়ি—এসবের কাজ করতো শশীবাবুর সঙ্গে।

অধ্যাপনা শুরু করার পরও ওই কাজটা ছাড়েনি। এখন শশীবাবুকেই বেশীর ভাগ কাজ দেখাশোনা করতে হয়। প্রফেসর সোম কাজগুলো আদায় করে আনেন সরকারী অফিস থেকে।

ওইসব ছাড়াও অধ্যাপক সোম তার রোজকারের আসল পথটা চট করে বের করে ফেলেছে কলেজে ঢোকার পরই।

ছাত্র-ছাত্রীর অভাব নেই।

পড়াশোনার জটিলতা যত বাড়ছে ততই বাড়ছে কোচিং এর প্রয়োজনীয়তা।

তাই প্রফেসর সোম কলেজের আরও দু'তিনটে সাবজেক্টের অধ্যাপকদের নিয়ে নিজের বাড়ির একতলায় খান চার-পাঁচ ঘর নিয়ে কোচিং ক্লাসই শুরু করেছে। এ যেন একটা মিনি কলেজই।

ওর স্ত্রীই বিজনেস সাইড অর্থাৎ এই কোচিং ক্লাসের ব্যবসায়িক দিকটা দেখা-শোনা করে। রীতিমত অফিসই যেন।

ইদানীং প্রায়ই লোডশেডিং চলছে এই শহরেও।

যখন তখন আলো নিভে যায়। পাখা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই কোচিং ক্লাসে সে সব বালাই নেই। প্রফেসর সোম নিজের জেনারেটার রেখেছেন। লোডশেডিং-এও ক্লাস কামাই হবে না।

সকাল, সন্ধ্যা দুবেলাই ক্লাশ হয়, পালা করে এক এক বিষয়ের ছাত্র, অধ্যাপকরা আসেন। প্রফেসর সোম নিজেও ক্লাশ নেন।

ফলে তার রোজকার হয় দুদিক থেকেই।

নিজের ক্লাস করার জন্য টাকা তো পানই পুরো। অন্য অধ্যাপকরা যে সব ক্লাস নেন, তাতে ছাত্রদের কাছ থেকে যে টাকা আসে আর অধ্যাপকদের যা দিতে হয়, যোগ বিয়োগ করে যা বিয়োগফল থাকে সেটাও কম নয়। আর ওই সব অধ্যাপকরাও অবসর সময়ে ক্লাস নিয়ে বেশ ভালো পয়সাই পান। তারাও প্রফেসর সোমের কাছে এই বাড়তি রোজকারের জন্য কৃতজ্ঞ থাকেন।

ফলে কলেজেও প্রফেসর সোমের একটা শক্ত ভিত আছে। সহজে তাকে কেউ

কিছু বলতে সাহস করে না। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবও তাকে ঘাঁটায় না। ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল এখন সুবিনয়। তার কিন্তু ভালো লাগে না প্রফেসর সোমের এই ব্যাপারটা।

কারণ প্রফেসর সোম ওই কোচিং ক্লাসেই এত ব্যস্ত থাকেন যে কলেজের প্রথম দিকের পিরিয়ডগুলোয় প্রায়ই আসতে পারেন না।

কলেজের ক্লাস বাদ যায়।

দু'একবার বলেছে সুবিনয় প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকেও এ নিয়ে।

কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল সাহেব জানেন আর ক'মাস মাত্র তাঁর চাকরী। তারপরই অবসর নেবেন। তাই বলেন সুবিনয়ের কথায়।

—বলছি প্রফেসর সোমকে।

কিন্তু তেমন ভাবে জোর দিয়ে বলে চাকরীর শেষপ্রান্তে এসে তিনি আর কারোও অপ্রিয়ভাজন হতে চান না।

ফলে প্রফেসর সোম নিজের মর্জি মতই কলেজে আসে। ক্লাস ড্রপ করতে হয়। তাতেও তার কিছু যায় আসে না।

সুবিনয় দেখছে ব্যাপারটা। এবং শিক্ষা নিয়ে প্রফেসর সোমের এই বেসাতি মোটেই ভালো ঠেকে না।

কিন্তু প্রফেসর সোমের এখন আমদানী ভালোই। নিজের গাড়িও কিনেছে।

টাকার দিকে তার অভাব নেই। এবার সোম ভাবছে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব রিটায়ার করলে সুবিনয় হবে প্রিন্সিপ্যাল। আর তখনই অসুবিধা হবে তার।

একা তারই নয়। তার কোচিং ক্লাসের অন্য অধ্যাপকদেরও। যখন তখন ক্লাস কামাই করে কোচিং ক্লাস করা মুস্কিল হয়ে পড়বে।

সোম কোচিং ক্লাস নিতে ব্যস্ত।

ওদিকে অফিসে মিসেস সোম ছাত্র-ছাত্রীদের মাইনে নিয়ে এক এক জনের নামে জমা করছে।

অবশ্য অঙ্কটা পুরো দেখানো হয় না।

ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট আছে।

সে সবদিক ভেবে বুঝে সমঝে কাজ করে এরা।

প্রফেসর সোমের কলেজে আজ দুটো ক্লাস ড্রপ করতে হলো। এমন প্রায়ই হয়।

আজ অবশ্য আরও একটা কাজ ছিল তার কন্ট্রাকটারি ফার্মেরও।

কলেজে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং হবে। কয়েক লক্ষ টাকা সরকার দিচ্ছে। তিনতলা একটা ব্লক উঠবে।

শশীবাবু এসেছে।

বলে—ওই কাজটা চাই আমাদের মিঃ সোম। যে ভাবে হোক ওই কাজটা পেতেই হবে। এভাবে টেন্ডার দেব যাতে আমাদের কুড়ি পার্সেন্ট অন্ততঃ থাকে। কয়েক লাখ টাকা হাতে আসবে।

সোমও ভাবছে কথাটা।

বলে সে—কিন্তু এর আগে কলেজ হোস্টেলের কাজ করলেন। কাজ তেমন ভালো হয় নি। এবার গভর্নিং বডি কি কাজ দেবে?

শশীবাবু বলে—তবে আপনি আছেন কেন? আপনি বললেই হবে কাজটা।

কি ভাবছে মিঃ সোম।

বলে—প্রিন্সিপ্যাল তো ছুটিতে যাচ্ছেন। এখন অ্যাকটিং প্রিন্সিপ্যাল ওই সুবিনয়বাবু। পরে ওই প্রিন্সিপ্যাল হবে।

—ও তো লোক সুবিধের নয়। কড়া। উনি যদি বাধা দেন!

শশীবাবু বলে—ওকে প্রিন্সিপ্যাল হতেই যদি না দিই?

অবাক হয় সোম। এ যেন তার কথাই বলছে শশীবাবু!

মিঃ সোমও তাই চায়! শশীবাবু বলে—আপনিই বা কম কি? এ কলেজের সিনিয়র অধ্যাপক। আপনিই বা কেন হবেন না প্রিন্সিপ্যাল?

সোম বলে—সে তো গভর্নিং বডির ব্যাপার? সুবিনয়বাবুর সুনাম তো আছে।

—ছাই। শশীবাবু বলে—আপনি টেন্ডার খোলার দিন থাকবেন। আমাদের টেন্ডার যদি ও না পাশ করে, ওর প্রিন্সিপ্যাল হওয়ার সাধ এই শশী চক্কোত্তীই ঘুচিয়ে দেবে। দেখবেন আমার খেলা। আপনি টেন্ডারটা যাতে নেয় তাই দেখবেন।

শশীবাবু চলে গেছে।

প্রফেসর সোম তখনও ভাবছে। হঠাৎ তার মনের অতলে আর একটা সত্তা যেন জেগে উঠছে। শশীবাবুই সেই সত্তাটাকে জাগিয়ে দিয়েছে।

এখন ভাবছে প্রফেসর সোম—সেই-ই বা কেন প্রিন্সিপ্যাল হতে পারবে না। একবার সে কলেজের সর্বেসর্বা হতে পারলে তার লাভ হবে আরও বেশী। দিনই বদলে যাবে।

তাই এবার বুঝে সমঝেই পা ফেলতে হবে তাকে। কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যেও নিজের প্রভাব আরও বাড়াতে হবে। নিজের দল ভারি করে তুলতে হবে। প্রয়োজন হলে এবার সুবিনয়বাবুর মত সৎ অধ্যাপকের বিরুদ্ধেও লাগতে হবে।

মিঃ সোম-এর লোভী মনের অতলে তাই এবার বদবুদ্ধিগুলো জেগে সাপের মত কিলবিল করছে। ফণা তোলার সুযোগ খুঁজছে সে।

সুবিনয় এসবের খবর রাখে না। শহরের কিছু স্বার্থান্ধ মানুষ যে তার পিছনে সবারই বিরুদ্ধে এমনি এক ষড়যন্ত্র করে চলেছে সে খবর রাখার তার সময়ও নেই।

সুবিনয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা আদর্শ নিয়ে চলে। সেই নিষ্ঠা, আদর্শ এই বর্তমান যুগে হয়তো অচল। সেটা ভাবে না সুবিনয়।

তাই সে বাড়িতে প্রাইভেট কিংবা কোচিং করে কোন পয়সা রোজগার করে না। কলেজেই পুরো ক্লাস নেয়, দরকার হলে স্পেশাল ক্লাস নেয়। তার জন্য ছাত্রদের

কাছে সে পয়সা নেয় না।

ছাত্রদের পড়ান তার কর্তব্য তাই ভাবে সে। কলেজে ইদানীং তার কাজও বেড়েছে। সেই বাড়তি কাজটাও তাকে করতে হয়। কারণ প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ছুটিতে, তাই ভাইস-প্রিন্সিপ্যালই এখন কার্যতঃ প্রিন্সিপ্যাল। সেই দায়িত্বও তাকে পালন করতে হয়।

সকালে কলেজে এসে সুবিনয় ক্লাসগুলো ঘুরে দেখে। কোন্ অধ্যাপক দেরীতে আসেন বা আসেন নি, সে-সবও দেখে অফিসে এসে বসে।

আজ ঊর্মিকে নিয়ে সুবিনয় কলেজে এসে ঢোকে।

ঊর্মি দেখছে তার ভবিষ্যৎ-এর কর্মস্থানের চেহারাটা।

বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে কলেজের সীমাপ্রাচীর। খেলার মাঠ, গাছ গাছালি। একটা বড় পুকুরও রয়েছে। তার দিকে দুটো তিনতলা ছাত্রাবাস—একটা ছেলেদের অন্যটা মেয়েদের।

এদিকে কলেজ বিল্ডিং এর কয়েকটা ব্লক। জায়গাটা ভালো লাগে ঊর্মির।

ছাত্ররাও আসতে শুরু করেছে কলেজে। সুবিনয়কে দেখে তারাও নমস্কার করে।

সুবিনয় ঊর্মিকে নিয়ে এগিয়ে যায় তার নিজের অফিসের দিকে।

নিজের চেম্বারে এসেছে সুবিনয়—ভাইস প্রিন্সিপ্যাল বোর্ড টাঙানো।

দু চারজন প্রফেসার এসেছে—সুবিনয় তাদের সঙ্গে ঊর্মির পরিচয় করিয়ে দেয়।

—আমাদের নতুন সহকর্মী প্রফেসর ঊর্মিলা সেন। ওকে রুটিন দিয়ে দিন গোবিন্দবাবু, আর ঊর্মি—আমি চাইবো ছাত্রদের পড়াশোনায় যেন তোমার অবদান কিছু থাকে।

ঢুকছে মিঃ সোম—নমস্কার ঊর্মিলাদেবী, নতুন এলেন আজ? আমি প্রফেসর সোম, ইংরাজীর অধ্যাপক।

ঊর্মি নমস্কার করে বলে—ক্লাসে যাচ্ছি, পরে দেখা হবে।

ইস—হ্যাঁ। সোম ওকে বিদায় দিয়ে চেয়ারে বসে পাইপ ধরায়।

সুবিনয় বলে—আজ দুটো পিরিয়ড অফ্ করলেন মিঃ সোম!

মিঃ সোম বলে—আর বলবেন না, ছেলেটার জ্বর, তাই—

সুবিনয় দেখছে ওকে। বলে—ক্লাসে যান।

মিঃ সোম বলে—যাচ্ছি। বাই দি বাই—আমাদের কলেজ বিলডিং এক্সটেনশনের কাজটা শশীবাবুকেই দিন। চেনাজানা লোক—আর রেটও কম করবে।

সুবিনয় বলে—কমিটি তা চান না। শশীবাবু বোর্ডিং করেছেন—ও বিলডিং দিয়ে জল পড়ছে। বাজে কাজ করেছেন—তাকে আর কাজ দিতে চান না কমিটি।

মিঃ সোম বলে—আপনিই সব—আপনি বললেই হবে।

সুবিনয় বলে—আমি বলতে পারবো না। স্যরি, দেরি হয়ে যাচ্ছে—ক্লাসে যান।

মিঃ সোম উঠে পড়ে বেশ অখুশি ভাবেই।

ইরা তার ছেলে বিমুর জন্মদিন উৎসব এবার বেশ ধুমধাম করেই করতে চায়। কিন্তু সুবিনয় বলে—অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই করবে। তাই বলে উৎসবের নামে একগাদা টাকা খরচ করার মতো অবস্থা আমার নেই তা জানো ইরা!

ইরা বলে—অন্যদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে তো যাও, সেদিন মিঃ সোমের ছেলের জন্মদিনে, ভরতবাবুর মেয়ের জন্মদিনেও দেখলে তো কত ধুমধাম করলো ওরা।

সুবিনয় দেখছে ইরাকে।

বলে সুবিনয়—ওদের সঙ্গে তুলনা করো না ইরা। ওদের রোজগারও অনেক বেশি। তাই—তারা করে।

সুবিনয় নিজের হিসাবটা বড় করে দেখে। আয় তার কম। তাই ঘটা বাড়াতে চায় না সে।

ইরাকেও সমাজে বাস করতে হয়। তাকেই সংসার চালাতে হয়। বাজার করে, বাইরে যাতায়াত করে।

দেখেছে ইরা একদিন এই রোজগারেই তাদের সংসার চলেছে ঠিকমত। ক্রমশঃ ঘটাও বাড়ছে।

সংসারে তার ছেলে মেয়ে আছে। তারাও আর পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করে। তাদের জন্মদিনের উৎসবেও যায়। দেখেছে তাদের পোষাক আশাক, অনেকেরই গাড়িও আছে। প্রফেসর সোম, প্রফেসর গুণী দাস এর ছেলেমেয়েরা, গাড়িতে যাতায়াত করে।

বাজার করতে আসে মিসেস দাস, মিসেস সোম গাড়ি হাঁকিয়ে। আর বাজারের, ঘটাও দেখে তাদের ইরা।

নিজেকে অনেক ছোট মনে হয়।

তাকে মাপা পয়সায় বাজার করে রিক্সায় চেপে ফিরতে হয়।

—ও মা। বাজার হয়ে গেল ইরা?

মিসেস সোম যেন ইচ্ছে করেই তাকে থামিয়ে দেয় গাড়ি থেকে নেমে। ইরা বলে, হ্যাঁ। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে হবে। চলি—ইরা তবুও এসব সহ্য করেছে একদিন। স্বামীকে সে তার নিজের দাবী তুলে বিরক্ত করে নি। আদর্শচ্যুতও করতে চায়নি।

নিজেই মুখ বুজে এই সব নীরব অপমান সহ্য করেছে ইরা। সংসারের অভাবকেও মেনে নেবার চেষ্টাই করেছে।

বিমুর জন্মদিন আসছে।

ইরা এবার তার ছেলের জন্মদিনে একটু উৎসব করতে চায়। দু চারজনকে নিমন্ত্রণ করার কথাও ভাবে।

বিমু, শুভার জন্য নতুন পোষাকও চাই।

তাই ঘটা একটু বেশীই হবে।

তাই নিয়ে সুবিনয়কে বলতে সুবিনয় তার হিসাব মতই কথাটা বলে—ওসবে দরকার নেই ইরা। আমাদের কাছে ঘটা করার মত পয়সা তো নেই।

জন্মদিনে আশীর্বাদ করো তাদের, তারা যেন মানুষ হয়। সুখী হয়।

ইরা চুপ করে থাকে।

বিমুকেও বলেছে সে তার জন্মদিনে পার্টি দেবে। তাই নিয়ে বিমুও তার স্কুলের দু-চারজন বন্ধুকে বলেছে।

শুভাও জানিয়েছে তার বন্ধুদের।

তারাও সব শুনে হতাশ হয়। শুভা বলে—তাহলে জন্মদিনে পার্টি হবে না মা। ঊর্মি মাসী বলেছিল ও রিহার্সেল দিয়ে আমাদের নাচ-গান-এর প্রোগ্রাম তৈরী করে দেবে।

বিমুও চুপ করে থাকে।

ইরা দেখছে তার ছেলেমেয়েদের। ওদের মুখে কি মা হয়ে সে হাসি ফোটাতে পারে না? সংসারের অভাবের বোঝা কি ওদের এখন থেকেই বইতে হবে? সেখানে এতটুকু আনন্দের স্বাদ কি তাদের স্বপ্ন হয়ে থাকবে?

রাত নামে।

কি ভাবছে ইরা। ছেলেমেয়েরা যেন হতাশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ইরার ঘুম আসে না। আজ তার মন যেন কোথায় সুবিনয়ের ওই আদর্শকে মেনে নিতে পারে না।

একটা পথ তাকে নিতেই হবে।

এইভাবে আদর্শের দোহাই দিয়ে অভাবকে মেনে নেবে না সে। নিজেকেও কিছু রোজগারের পথ খুঁজে নিতে হবে। সেও লেখাপড়া শিখেছে। অনার্স গ্রাজুয়েট। এমনি অভাবকে নীরবে সে মেনে নেবে না।

ফোনটা বাজছে। এতরাতে ফোনটা বাজতে দেখে উঠে গিয়ে ফোনটা তোলে ইরা।

—ইরা? কি রে ডিসটার্ব করলাম না তো?

ইরা বেশ কিছুদিন পর বোম্বাই থেকে মীরার খুশি ভরা কণ্ঠস্বর শুনে খুশীই হয়। মীরা তাকে মাঝে মাঝে ফোন করে খবর নেয় ওর সংসারের। ছেলেমেয়েদের।

আর বিমুর জন্মদিন আসছে সেটাও মীরা বোম্বাইএ বসে এত কাজের মধ্যেও ভোলেনি।

মীরার কথায় ইরা বলে—না, না, ডিসটার্ব করবি কেন ?

মীরা জানায়—শোন, সামনের সোমবার বিমুর জন্মদিন। যেতে পারছি না। দুরিয়র সার্ভিসে ওর জন্য হাজার টাকার ড্রাফট্ পাঠালাম আজ। ওকে কিছু কিনে দিবি।

ইরা একটু অবাক হয়।

মীরা ওখানে তাহলে ভালোই আছে। টাকার অভাবও নেই তার মত।

ইরা বলে—কেমন আছিস ?

মীরা বলে—চলে যাচ্ছে ? অফিস, কাজ, মডেলিং এই সব করছি। সময় পাই না। টাকার পিছনেই ছুটছি।

ইরা বলে—ভালই তো ! টাকারও দরকার !

মীরা কোথায়—টাকাই সব নয় রে ? একা—নিঃসঙ্গ। কেমন হাঁপিয়ে উঠি মাঝে মাঝে। তুইই বরং ভাল আছিস রে। স্বামী-সংসার-ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুখেই আছিস।

হাসে ইরা মীরার মুখে তার সংসারের শান্তির কথা শুনে। ইরা বলে—দীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।—বুঝলি ! সুখী কে তা জানি না রে। মনে হয় তুই ভালই আছিস। কোন দায় ভাবনা নেই। বিয়ে করে যেন ঠকে গেছি বলেই মনে হচ্ছে।

মীরা ওদিক থেকে বোনের কথা শুনে বলে—পাগলী, এটা মুক্তির জীবন নয় রে. ড় ঝড়ের জীবন। তুই একটা অন্যজগতেই রয়েছিস, যেখানে ঝড়ের হাওয়া সব ছনছ করে দেয় না। ঘরের প্রদীপশিখা সেখানে স্থির হয়ে আলো দেয়। ছাড়ছি। প্রফেসরকে আমার নমস্কার দিবি।

ফোনটা রেখে দেয় ইরা। ভাবছে এবার সে মীরার কথা। চাকরী নিয়ে ভাল ভাবেই আছে। অভাব তো তার নেই।

ইরাও এবার চাকরীর কথাটা ভাবছে।

এর মধ্যে সে এখানকার মেয়েদের স্কুলের সেক্রেটারীর সঙ্গেও দেখা করেছে। ই স্কুলের ছাত্রী ছিল সে। ছাত্রী হিসেবেও সুনাম ছিল ইরার।

হেডমিস্ট্রেস মিসেস চৌধুরীও ইরাকে স্নেহ করেন। এছাড়া শিক্ষকতার জগতে খানে সুবিনয়ের সুনামও আছে। তাই ইরাকে স্কুলের শিক্ষিকার চাকরীর জন্য খান্ত করতে দেখে মিসেস চৌধুরী জিজ্ঞেস করেন। —সত্যিই চাকরী করতে চাও মি ইরা ?

ইরার আজ সংসার চালাতে টাকার দরকার। তাই বলে সে—হ্যাঁ। তাছাড়া লেমেয়েরা এখন দুপুরে স্কুলে থাকে। উনিও কলেজে। সময় কাটে না। স বসে পড়াশোনার চর্চা ভুলে যাচ্ছি। ভাবছি শিক্ষকতা শুরু করলে এম-এটা য়ে দেব।

মিসেস চৌধুরী বলেন—তাহলে আপাততঃ ডেপুটেশন ভেকেন্সীতে ঢুকে

পড়। পরে দেখা যাবে কিভাবে কনফার্ম করা যায় তোমাকে।

ইরাও যেন হাতে চাঁদ পায়। চাকরীটা এত সহজে তার হাতে এসে যাবে ভাবেনি সে।

শুভা, বিমুর জন্মদিন আসছে। শুভা এর মধ্যে ঊর্মি মাসীর খুব কাছেই এসে গেছে। সুবিনয় এর চেষ্টায় ঊর্মির একটা ছোট্ট বাসাও জুটে গেছে তাদের পাড়ার একটু দূরে। শুভাও সেখানে যায়।

ঊর্মিও আসে কলেজের পর এ বাড়িতে। ইরার টাকার অভাবটা পূরণ করেছে কিছুটা মীরার পাঠানো ড্রাফ্‌টায়। জন্মদিনের আয়োজনও চলছে। পার্টিও হবে। ইরা বনমালীকে নিয়ে খাবারের মেনুও করেছে। জামা-কাপড়ও কেনা হয়েছে। সুবিনয় এসবের খবর রাখে না। ইরাও তাকে কিছু বলেনি। আর টাকাও চায়নি তার কাছে।

সুবিনয় আগেই কলেজে চলে যায়। ইরা শুভা বিমুকে স্কুলে পাঠিয়ে নিজে খাওয়া-দাওয়া করে বের হয়ে যায় স্কুলে। ফেরে বৈকালে। সুবিনয় তখনও কলেজেই থাকে। তাই ইরার চাকরী নেওয়ার খবরটা এতদিন জানতেও পারেনি।

খবর পায় সেদিন কলেজেই। কলেজের হেডক্লার্ক মনুবাবুই গার্লস স্কুলে তার মেয়েকে পৌঁছে দিতে গিয়ে দেখেছে ইরাকে।

সেইই বলে এসে সুবিনয়কে।

—বৌমাকে দেখলাম গার্লস স্কুলেই শিক্ষকতা করছেন। মেয়েরাও ওর পড়ানোর খুব প্রশংসা করছিল স্যার। আমি তো স্পষ্টই বললাম, উনি পড়াবেন না তো কে পড়াবেন। ওর স্বামী তো এতবড় শিক্ষক।

সুবিনয় একটু অবাক হয় খবরটা শুনে। ইরা যে চাকরী নিয়েছে কথাটা তাকে একবারও জানায়নি। তার অমতেই ইরা একাজ করেছে, আর খবরটা ইচ্ছা করেই তাকেও জানায় নি।

একটু ক্ষুব্ধও হয় সুবিনয়। তবু মনুবাবুর সামনে চুপ করেই থাকে।

সন্ধ্যার পর ইরা বাড়ি সাজাতে ব্যস্ত।

কালই ওদের জন্মদিনের পার্টি। রংবেরং এর কাগজের চেন, রঙীন আলো বেলুন এসবও এসেছে। শুভা, বিমুও খুব খুশী। বনমালীকে নিয়ে তারাই ঘর, ড্রইং রুম সাজাতে ব্যস্ত। ইরাও রয়েছে।

সুবিনয়কে ফিরতে দেখে ইরা চাইল! শুভা বলে—কেমন সাজাচ্ছি দেখ বাবা কাল এখানেই অনুষ্ঠান হবে।

—তাই নাকি!

বিমু বলে—হ্যাঁ! জানো না তুমি! নাচ গান—আমার জন্মদিন না?

সুবিনয় ওদের কিছু বলে না। কাছে টেনে আদর করে। চাইল সে ইরার দিকে ইরা চুপ করেই থাকে। সুবিনয় নিজের ঘরের দিকে চলে গেল কোন কথা না বলে।

একটু পরে ইরা চা খাবার নিয়ে যায় ওর ঘরে। সুবিনয় পোষাক বদলে হাত

ুখ ধুয়ে লুঙ্গি পরে বসে একটা জার্নালের পাতা ওলটাচ্ছে।

ইরা চা খাবার নিয়ে এসেছে। বলে সে—ছেলেমেয়েরা ধরলো তাই ছোটখাটো কটু অনুষ্ঠান করছি। দু'চার জনকে বলেছি কাল। ঊর্মিও ওদের প্রোগ্রাম রাচ্ছে। ভেবেছিলাম বলবো তোমাকে—অবশ্য টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। মীরাই াঠিয়েছে—

সুবিনয় দেখছে ইরাকে।

বলে সুবিনয়—টাকাটাও নয়, ফাংশানও নয়, এসব ছাড়াও তুমি আর একটা বরও জানাওনি আমাকে ইরা। আর সেই খবরটা আমাকে শুনতে হয় অন্য লোকের মুখ থেকে।

—মানে! কি বলছো তুমি? ইরা অবাক হয়।

সুবিনয় বলে—তুমি শিক্ষিকার চাকরী নিলে আমি বাধা নিশ্চয়ই দিতাম না। লেখাপড়া শিখেছো—সেটাকে কেন সৎকাজে লাগাবে না। কিন্তু সেই চাকরী নিলে, কুলেও যাচ্ছো অথচ আমাকে একবারও জানাও নি।

ইরা ওর কথার স্বরে এবার নিজেই কষ্ট পায়। সুবিনয়ের উপর চাপা অভিমান ার ছিল। তাই চাকরীটা নিয়েছিল সে। কিন্তু তাকে অপমান, অবজ্ঞা করতে ায়নি।

তাই সুবিনয়ের কথায় বলে ইরা—সত্যি, ভুল হয়ে গেছে। বলবো বলবো করে লাই হয়নি। তুমি রাগ করেছো? এ্যাই!

সুবিনয় দেখছে স্ত্রীকে।

ইরা বলে—যা দিনকাল পড়েছে তাতে একার রোজগারে দিন চলে না। চাকরীটা য়ে গেলাম তোমার নামেই। তাই নিলাম, সংসারে কিছুটা সুরাহা হবে! তুমি দ অমত করো—বলো, ছেড়ে দিই।

সুবিনয় বলে—তা বলছি না। বলছিলাম সুখবরটা পেলে আমিও খুশী হতাম।

ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায়, জন্মদিনের উৎসবের ঘটায়। ঊর্মিও ছেলেমেয়েদের য়ে সুন্দর অনুষ্ঠান করে।

সুবিনয়ও বেশ প্রাণ খুলেই ওই জন্মদিনের উৎসবে যোগ দেয়। বাড়িতে স্বাভাবিক বস্থাটা ফিরে আসে, খাওয়া-দাওয়ার কোন ত্রুটি হয় না। বিমুর জন্মদিন ভালো াবেই কেটে গেল।

হিসাবে কিছু বাড়তি খরচ হয়ে যায় ইরার। আর সেই ঘটাটাও কয়েকশো কা। মাইনে পেতে দেরী আছে ইরার। সুবিনয়ের কাছে টাকাও চায় নি। কটা ন কোন মতে কষ্টে-সৃষ্টে চালিয়ে নেবার চেষ্টা করে ইরা।

তাই সংসারের হিসাবটাও কিছু ছাঁট-কাট করে। আর নিজের দৈনিক খরচাও মাতে হয়েছে।

উৎসবের ঘটার জন্য ইরার টাকাতেও টান পড়েছে। স্কুলে যেতো সে রিকশায় র। আসা-যাওয়ায় পাঁচ টাকার মত খরচ পড়ে। ইরাকে এ মাসে হেঁটেই যেতে

হবে পয়সার সাশ্রয়ের জন্য।

বেশ কিছুটা পথ, রোদে যেতে কষ্ট হয়।

মিসেস চৌধুরীই বলে—এতটা পথ হেঁটে আসো ইরা এই রোদে ?

ইরা বলে—না, ইয়ে রিকশা পেলাম না কিনা।

ব্যাপারটা সেদিন সুবিনয়ের চোখেও পড়ে। কলেজে সেদিন কিসের ছুটি হয়ে গেছে। সুবিনয় ফিরছে, হঠাৎ দেখে ওই রোদে ইরাও ফিরছে হেঁটে। সুবিনয় রিকশা থামিয়ে বলে—এ কি! হেঁটে ফিরছো!

ইরা চাইল। সুবিনয় বলে—উঠে এসো।

ইরা রিকশায় উঠলো।

সারা পথ ওরা দুজনে চুপ করেই আসে। দুজনে যেন দুজনের কাছে ধরা পড়ে গেছে। ইরা মুখ বুজেই সব কষ্টকে সহ্য করে চলেছে।

বিকাল নামছে।

সুবিনয় নিজের ঘরে কাজ করছে। চা নিয়ে ইরাকে আসতে দেখে চাইল ইরা এখন কিছু স্বাভাবিক, সুস্থও।

সুবিনয় বলে—ক'দিন তুমি রিকশাতে যাতায়াত করো না। এই রোদে এতটা পথ হেঁটে যাও।

ইরা বলে সহজ সুরে—পাঁচটা টাকা তো বাঁচে। খরচা হয়ে গেছে বেশি এ মাসে ও কিছু না, হাঁটাও ভালো শরীরের পক্ষে।

সুবিনয় দেখছে ইরাকে। ইরা বলে—দুটো টুইশানিও নিয়েছি।

সুবিনয়কে যেন আঘাতই দেয় ইরা। সুবিনয় বলে—স্কুল, বাড়ির কাজ তার উপর টুইশানি—

ইরা বলে—আদর্শ নিয়ে তুমি থাকো, সেখানে বাধা দিইনি। আমার ব্যাপারে সাইবো—তুমি কথা বলবে না।

আজ ইরা নিজের এই পরিবর্তনে কেমন বিস্মিত বোধ করে; মনের গ্লানি যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। সুবিনয় আর ইরা আজ যেন দুটি দুই মেরুর বাসিন্দাতে পরিণত হতে চলেছে।

কলেজ কমিটির মিটিং হবে, সেক্রেটারী শীতলবাবু প্রেসিডেন্ট ডাঃ নিবারণ রায়, ওঁরা মনে মনে সুবিনয়বাবুকেই প্রিন্সিপ্যাল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কমিটির অন্য মেম্বারদের কথাটা জানাতে হবে, তখন কমিটির মিটিং-এ তাদের সিদ্ধান্ত পাশ করাবার বাধা থাকবে না।

হঠাৎ এমনি দিনেই ব্যাপারটা ঘটে যায়।

প্রফেসার সোম ভেবেছিল কমিটি তাকেই প্রিন্সিপ্যাল করবে, কিন্তু কমিটির দুচারজন তার চেনাজানা, তারাই খবরটা দেয় সোমকে—কমিটি সুবিনয়বাবুর কথাই ভাবছে।

মিঃ সোম হিসেবী ব্যক্তি। ব্যবসায়ী সে।

শিক্ষাকে ব্যবসায়ে পরিণত করেছে, তার বন্ধু শশীবাবুর কনট্রাকটারি ফার্মেও তার কিছু অংশ আছে। মিঃ সোম এর কিছু বন্ধুবান্ধবও আছে কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে। তারা সুবিনয়বাবুকে পছন্দ করে না।

কারণ ক্লাসে ফাঁকি দেওয়াটাকে মেনে নিতে পারে না সুবিনয়বাবু। প্রফেসারদের টাইমে কলেজে আসতে হয়, গ্রান্ট ইন এড, কলেজের টাকা নয় ছয় হোক এটা সে চায় না।

তাই কিছু কর্মচারী, অধ্যাপক মহলে সুবিনয়ের শত্রু কিছু আছে। মিঃ সোম তাদেরই হাতে এনে নিজের দল ভারি করেছে। তাই দুচার জন অধ্যাপক—কমিটির দু'একজন মেম্বারকে ধরেছে তারা।

মিঃ সোমই কলেজের অধ্যক্ষের পদ চায়, এই পোস্টে আসতে পারলে মিঃ সোম তার কনট্রাকটারি ফার্মকে নতুন বিল্ডিং তৈরি করার স্যাংশন দিতে পারবে, কয়েক লক্ষ টাকা মুনাফা করবে। তাই মিঃ সোম সব শক্তি দিয়েই বাধা দিতে চায়। সুবিনয়কে প্রিন্সিপ্যাল হতে সে দেবে না।

ওদিকে বিল্ডিং কনট্রাকট দেবার জন্য চাপও রেখেছে কমিটির কাছে। জনগণের নাম দিয়ে বলে মিঃ সোম কমিটিকে—নতুন বিল্ডিং শুরু করতেই হবে। নাহ'লে শহরের লোকদের কাছে মুখ থাকবে না।

সেক্রেটারী বলে—সুবিনয়বাবু, এখন অ্যাকটিং প্রিন্সিপ্যাল। তাকেই বলছি।

সুবিনয় সেদিন ঊর্মিলার ওখানে গিয়ে একটি তরুণকে দেখে। ড্রইংরুমে বসে

গল্প করছে তারা। বাইরে জিপটা দাঁড়িয়ে আছে।

ঊর্মিলাই পরিচয় করিয়ে দেয়—সুরেশ দত্ত, পি-ডব্লু-ডির ইঞ্জিনিয়ার। সুরেশ—ইনি আমার মাস্টারমশায় ডঃ সুবিনয় ঘোষ। কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল—

সুরেশও খুশি হয়। বলে—আপনার কথা অনেক শুনেছি ঊর্মির মুখে। আজ দেখা হলো, আপনি না এলে অবশ্য আমাকেই যেতে হতো আপনার ওখানে নেমন্তন্ন করতে!

সুবিনয় বলে—নেমন্তন্ন!

হাসে সুরেশ, বলে সে—আমরা বিয়ে করবো ঠিক করেছি সামনের মাসেই।

খুশি হয় সুবিনয়—বাঃ!

দেখে ঊর্মি সলজ্জভাবে বসে আছে। সুবিনয় বলে—কথাটা জানাও নি ঊমি!

ঊমি জবাব দিল না। বলে সে—আপনারা কথা বলুন। চা আনছি।

সুবিনয়ও খুশি হয় সুরেশের সঙ্গে আলাপ করে। সুরেশ বলে—এদিকে এসেছিলাম একটা ব্রিজের এনকোয়ারীতে। এখানের শশীবাবুরা ব্রিজটা করেছিলেন তিন মাসের মধ্যে ভেঙে পড়েছে। সাবস্ট্যান্ডার্ড কাজ করে চুরি করে সরকারের প্রায় বারো লাখ টাকা ওরা লোকশান করেছে, অ্যাকসিডেন্টে দুজন মারা গেছে। ওর বিরুদ্ধে ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওরই নেব আমরা।

সুবিনয় খবরটা শুনে অবাক হয়। বলে সে—তাই নাকি! এখানের কলেজ বিল্ডিং করতে চায় ওরা।

সুরেশ বলে—ওরা ব্ল্যাকলিস্টেড হয়ে গেছে। ওদের কাজ দিলে সরকার বিল পাশ করবে কিনা সন্দেহ আছে। বিপদে পড়বেন।

খবরটা শুনে একটু অবাক হয় সুবিনয়।

ঊর্মি চা এনেছে। সুবিনয় বলে—এখন থাক। উঠি আজ, সুরেশ দত্তও এগিয়ে আসে গেট অবধি। মনে করিয়ে দেয়—আসতেই হবে কিন্তু।

মিঃ সোম কলেজের সেক্রেটারীকে বলেও কিছু করাতে পারেনি বিল্ডিং কনট্রাকটএর ব্যাপারে। তিনি সব দায়দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন সুবিনয়বাবুর উপর।

মিঃ সোম তাই শশীবাবুকেই কথাটা জানায়।

বলে সোম—লোকটা মোটেই ভাল নয়। ওকে প্রিন্সিপ্যাল হতে দিলে বিপদই বাড়বে।

শশী ব্যবসাদার লোক। বলে সে—নিজে গিয়ে বলে দেখি কন্ট্রাক্টের ব্যাপারে। টোপ-টাপও দিচ্ছি। গিলে ফেলে ভালই। কাজটা দিয়ে কোন ঝামেলা হবে না। না হ'লে অন্যপথই ধরতে হবে সোমবাবু।

সেই কারণেই শশীবাবুর জিপটাকে দেখা যায় কলেজ কম্পাউন্ডে ঢুকতে।

শশীবাবু এমনিতে বিনয়ী, নম্র। মনের ভিতর আগুন জ্বললেও বাইরে তার একটুকু প্রকাশ ঘটতে দেয় না। কড়া কথা বললেও স্বর তার চড়ায় ওঠেনি। এই

তার ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র।

সুবিনয় অফিসের কাজে ব্যস্ত।

এর মধ্যে শশীবাবুকে ঢুকতে দেখে চাইল। অফিস এখন প্রায় ফাঁকা। কলেজের ছুটি হয়ে গেছে। সুবিনয় বৈকালে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে। শশীবাবু বলে—বিল্ডিং কনট্রাক্টের ব্যাপারে এসেছিলাম স্যার। আপনি যা করবেন তাইই হবে। আমাদেরই টেন্ডারটা নিয়ে নিন। খরচাও কম হবে। আর আপনাকেও—এদিক ওদিক চেয়ে শশীবাবু তার ছোট ব্যাগের চেন খুলে দুটো পাঁচ হাজার টাকার বান্ডিল বের করে দেয়।

—এখন এই দিচ্ছি। পরে কাজ শুরু হলে আর পঁচিশ হাজার, বলেন তো তিরিশ, চল্লিশ কুল্যে পঞ্চাশ হাজারই দেব। কাজের কোয়ালিটি দেখে নেবেন—

সুবিনয় চমকে ওঠে। বলে সে—ওগুলো তুলে রাখুন, প্লিজ।

ওর কণ্ঠস্বরে এমন একটা ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে যাতে শশীবাবুর মত দুঁদে লোকও একটু হকচকিয়ে যায়।

—তুলে নিন!

—নিচ্ছি স্যার! শশীবাবু ওগুলো তুলে নেয়।

তবু বলে সে—টেন্ডারটার কথা—

সুবিনয় বলে—ওটা দেওয়া সম্ভব নয়। সরকারী পয়সায় কাজ হবে। কোন ব্যাক লিস্টেড কনট্রাক্টর দিয়ে কাজ করলে সেই বিল স্যাংশন করতে পারবো না! তারা পাশ করবে না।

অবাক হয় শশীবাবু।

ওই গোপন খবরটা এখন অন্য কেউ জানে না। শশীবাবু চেষ্টা করছে, সেই গালমালটা মিটিয়ে নিতে পারবে কোন রকমে, এখনও চেপেই রেখেছে খবরটা। কিন্তু সেই খবর এ পেল কি করে! শশীবাবু বলে—কে বলেছে ওসব কথা?

—নশীপুরের ব্রিজ আপনারা তৈরী করেছিলেন!

শশীবাবু ঘাবড়ে গেলেও মুখে বলে—ওসব বাজে খবর। আমাদের কাজ দেবেন না তাই বলুন!

সুবিনয় বলে—যা ভাবেন। এখন আসুন। নমস্কার, আমি দুঃখিত আপনাদের জন্য কিছু করতে পারলাম না।

শশীবাবু বের হয়ে যায়।

রাগে অপমানে তার মনের ভিতর আগুন জ্বলে উঠেছে।

মিঃ সোম ওর পথ চেয়েই বসেছিল তার কোচিং ক্লাসের অফিসে। শশীবাবুকে দেখেই বুঝেছে সে ও ব্যাপারটা।

শশীবাবু বলে—ব্যাটা ওই প্রিন্সিপ্যাল শয়তানের হাড়।

মিঃ সোম বলে—প্রিন্সিপ্যাল এখনও হয়নি।

শশীবাবু বলে ওঠে—ওর সব খবর নিচ্ছি। তারপর এইসা ঘা মারবো যে ওর

প্রিন্সিপ্যাল হবার স্বপ্ন ছুটে যাবে। শশী চক্কোত্তীকে চেনে নি।

প্রফেসর সোমও তাই চায়। শুধায় সে—পারবে ?

শশীবাবু বলে—পারবো না মানে। পারতেই হবে। শুধু তোমাকে একটু মদত দিতে হবে। দেখবে ব্যাটা এখান থেকে পালাতে পথ পাবে না।

প্রফেসর সোমও তাই চায়। বলে প্রফেসর সোম—নিশ্চয়ই। তোমাকে মদত নিশ্চয়ই দেব শশীবাবু।

শশীবাবুই বুদ্ধিটা দেয়। প্রফেসরের সম্বন্ধে এমন ব্যাপার ঘটাতে হবে যেটা সহজেই সকলে বিশ্বাস করে। আর সেই খবরই চাই আমাদের।

প্রফেসর সোমের মস্তিষ্ক বেশ উর্বর। তাই সহজেই সেই সব খবরও তৈরী হয়ে যায়।

শশীর লোকজনেরও অভাব নেই।

তার কনট্রাকটারিতে অন্ধকারের কাজই বেশী হয়। তারা নিশাচরের দল।

তাই রাতের অন্ধকারে শশীও যেমন সক্রিয় হয়ে ওঠে তারাও তেমনি কাজে নেমে পড়ে বিদ্যুৎগতিতে।

ছোট শহর।

এখানে প্রায় সকলেই সকলকে চেনে, জানে।

কোথায় কি ঘটে তার সম্বন্ধে সবাই খবর রাখে।

শহরের মধ্যে অনেক বেকার, চলমান গেজেট আছে পাড়ায় পাড়ায় চায়ের দোকানে।

শহরের একটা মাত্র সিনেমা।

দেওয়ালে তার পোস্টার পড়ে। তাছাড়া আর পোস্টার পড়ে ভোটের আগে। তখন দেওয়ালে—গাছের ডালে—এখান ওখানে ভোট দেবার জন্য আহ্বান জানিয়ে বেশ কিছু রকমারী পোস্টার পড়ে। তারপরই আবার শুন সান হয়ে পড়ে সহরটা।

হঠাৎ আজ সকালেই সারা শহরের লোক শূন্য দেওয়ালে এক বিচিত্র সংবাদের পোস্টার দেখে অবাক হয়, চলমান গেজেটরাও অবাক।

এতবড় কাণ্ডটা ঘটেছে শহরে আর তারা সব খবর রাখে—এমনি সরস মুখরোচক খবরটা আদৌ জানতো না।

তাই তারাও নেমে পড়ে মাঠে এই সম্বন্ধে আরও কিছু খবর সংগ্রহের আশায়।

শহরের পথে, বাজারে, সিনেমার ওখানে, কলেজের সীমা-পাঁচীলের গায়ে রাতারাতি করা বিরাট পোস্টারগুলো ছাপিয়ে সেঁটে দিয়েছে।

সেই পোস্টারগুলো পড়ছে সবাই।

কেউ বলে—যাঃ। যত সব বাজে কেচ্ছা।

আবার অনেকে বলে হতেও পারে। একালে সবই সম্ভব। খোঁজখবর নিয়ে

দ্যাখ সত্যিই এসব চলছে। না হলে এভাবে ছেপে পোস্টার বের হবে কেন?

কে শুধোয়—কারা লাগিয়েছে এসব?

তার কোন নিশানা নেই। তবে পোস্টারগুলো থেকে যেন কি খবর সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

পরদিন সকালেই কলেজে হৈ চৈ পড়ে যায়, শহরের প্রধান রাস্তায় এখানে ওখানে কারা পোস্টার মেরেছে।

ডঃ সুবিনয় ঘোষের নব প্রেম!

সুন্দরী ঊর্মিলা সেনের প্রেমিক কে?

কলেজে মধুচক্রের নায়ক-নায়িকা কে?

সাধারণ মানুষের কাছে এমন রসাল মুখরোচক খবরটা বেশ সাড়া আনে। হৈ-চৈ পড়ে যায় শহরে।

ইরা সকালে বাজার গেছল।

ছুটির দিন—বাজার থেকে ফেরার পথে সেও দেখেছে কোনো দেওয়ালে বিশ্রী দুটি নারী-পুরুষের কুৎসিত ছবি, নীচে ঊর্মিলা আর সুবিনয়কে জড়িয়ে ওই পোস্টার।

দেখে বেশ কিছু লোক সেখানে ভিড় করেছে। উপভোগও করছে তারা।

কে মন্তব্য করে—ভেবেছিলাম সুবিনয়বাবু সাধু শিক্ষাব্রতী এখন দেখছি খাসা মাল।

গোগীবোষ্টম বলে—দোষ কি গো, ঘরে মাগ আর বাইরে সেবাদাসী। সহজিয়া সাধন গো।

দু'একজন চিনতে পারে ইরাকে।

রাগে লজ্জায় ইরার সারা মনে ঝড় উঠেছে। সে ভাবতে পারেনি যে সুবিনয় এমনি একটা কাজ করতে পারবে। হয়তো সত্যি কিছুটা আছে, নাহলে এত লোক প্রকাশ্যে তার নামে এভাবে কথা বলবে কেন?

সন্দেহ জিনিসটাই এমনি সংক্রামক আর বিশ্বাসও ঠুনকো।

আজ ইরার সামনে এই এত দিনের দেখা জগৎটাই যেন বদলে গেছে। সোনা রোদও বিবর্ণ হয়ে যায়। মনে হয় ঊর্মিলা সুবিনয়ের ঘনিষ্ঠতা সে দেখেছে আগেই, কিন্তু তেমন কিছু ভাবেনি। ঊর্মির সঙ্গে সহজ ভাবেই মিশেছে, তাই ঊর্মি আর সুবিনয় তার ভালোমানুষির সুযোগ নিয়ে ইরাকে এত বড় অপমান, অবজ্ঞা করে দুজনে একটা বিশ্রী সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

ইরার সব আশা, স্বপ্ন হারিয়ে গেছে। এত দিন সে সংসারের জন্য মুখ বুজে সব পরিশ্রম করেছে, সব অভাব কষ্টকে মেনে নিয়েছে। কিন্তু তার বিনিময়ে সুবিনয় তাকে এই ভাবে অপমানিত করবে তা ভাবতে পারেনি। এই বঞ্চনা ইরার সব চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছে।

ঊর্মিলাও সকালে এইসব পোস্টার, হ্যান্ডবিল দেখে চমকে ওঠে। কারা তার

এত বড় শত্রু তা সঠিক ভাবতে না পারলেও অনুমান করে ছুটে এসেছে সুবিনয়ের বাড়িতে।

ইরা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পৌঁছে দিয়ে বাজারে যাবে, সুবিনয় সকালে তার নতুন প্রবন্ধের বই-এর একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে ব্যস্ত, এমন সময় ঊর্মিলাকে ঝড়োকাকের মতো উস্কোখুস্কো অবস্থায় ঢুকতে দেখে চাইল।

সুবিনয় অবাক হয়—কি ব্যাপার ?

ঊর্মিলা বলে—আপনি কিছুই জানেন না ? সারা শহরের লোক জেনেছে, দেখুন কি ইতরামি এসব।

ঊর্মিলাই প্যাম্পলেট, একটা পোস্টারও এগিয়ে দেয়।

সুবিনয় দেখেই চমকে ওঠে—ছিঃ ছিঃ এইসব নোংরামি করবে ওরা !

—কারা !

সুবিনয় বলে—এ নিশ্চয়ই শশীবাবু, ওই মিঃ সোমদেরই কাজ। ওদের স্বার্থসিদ্ধি হতে দিইনি, কমিটি আমাকে প্রিন্সিপ্যাল করতে চায়, ওরা তা চায় না। তাই বাধা দেবার জন্যই এইভাবে চরিত্র হনন করে বদনাম দিতে চায়।

ঢুকছে ইরা, হাতে বাজারের থলে। চোখে মুখে দুঃসহ ক্লান্তি আর অপমানের কালো ছায়া।

ইরা সেই ঊর্মিলা আর সুবিনয়কে একান্তে দেখবে এখানে, এই বাড়িতে এই ঘটনার পর তা ভাবেনি। ইরার মনে ঝড় ওঠে। মনে হয় এক্ষুণি সে দুঃসহ জ্বালায় ফেটে পড়বে। কিন্তু বহু চেষ্টায় নিজেকে সামলে নেয়।

ঊর্মি ওকে দেখে বলে—বিশ্বাস করো বৌদি, এসব মিথ্যা। মিথ্যা রটনা।

ইরা সংযত স্থির কণ্ঠে বলে—আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কি আসে যায় ঊর্মি। ক্ষতি যা হবার তা হয়েছে। তোমার কতটুকু ক্ষতি হয়েছে জানি না, আমার ক্ষতি হয়েছে অনেক।

ইরা কথাগুলো বলে চলে গেল ভিতরে।

ঊর্মিলা দেখছে ইরাকে।

আজ ইরা বৌদিও তাকে ভুল বুঝেছে।

সুবিনয় জানে, প্রকৃত সত্য কি ?

ঊর্মিলাকে সে তার নিজের বোনের মতই দেখে। আর ঊর্মিলার বিয়েও হতে চলেছে।

সুবিনয় এসব খবরের কোন গুরুত্বই দেয় না।

প্রতিদিনের মত স্নান খাওয়ার পর কলেজে আসে।

দেখে কলেজের বাইরের দেওয়ালে সেইসব পোস্টার তখনও কিছু রয়েছে।

দু চারজন ছাত্র পড়ছে।

তাকে দেখে সরে যায় তারা।

সুবিনয়ও এসে কলেজে ঢোকে। সে নজর রাখছে কাদের এই কাজ। জানে

তারা কারা। কিন্তু হাতে নাতে প্রমাণ তার কিছু নেই। দেখা যায় আজ প্রফেসর সোম সকালেই কলেজে এসে নিপাট ভালোমানুষের মত ক্লাস নিচ্ছে।

…সুবিনয়ও যেন আমল দেবার মত কিছুই ঘটেনি এইভাবেই দিনভোর কাজ করে।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে।

দিন ঠিকই কাটে। তবে যেন কোথায় একটা চাপা উত্তেজনা রয়ে গেছে। সুবিনয়ের মনে হয় তার পেছনে একটা ষড়যন্ত্র দানা বাঁধছে। আর সে কঠিন হাতেই তার মোকাবিলা করবে।

ইরাও ভেবেছে সারাদিন।

ওই ঘটনাটা তার মনের অতলে ঝড় তুলেছে।

সুবিনয় ফিরেছে। ইরা চা-খাবারও আনে।

সুবিনয় দেখছে ওকে। এক দিনেই ইরা যেন অনেক বদলে গেছে।

—শোন।

ইরা দাঁড়ায় না। বলে—কাজ আছে।

আজ ইরার জীবনেও একটা যেন চরম অপমান-এর জ্বালা এনেছে ওই ব্যাপারটা।

রাত নামে।

ইরা ওঘরে ছেলেমেয়েদের শুইয়ে দিয়ে নিজে আজ আলাদা শোবার সিদ্ধান্তটা নেয়।

সুবিনয় ডাকে—ইরা! শোন!

ইরা কাছে আসে না। ওদিকের বিছানার গাদা থেকে ইরা একটা তোশক, র‍্যাগ, বালিশ নিয়ে ও-ঘরে চলে গেল। উঠে আসে সুবিনয়।

শুধোয় সে—কি ব্যাপার?

ইরা বলে—ও ঘরেই শুচ্ছি।

—মানে!

ইরা বলে—এ কাজের মানে তুমি ভালো করেই জানো। আমি নিজের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো নাটকই করতে চাই নে। আমাকে আমার পথে শান্তিতে থাকতে দাও। তোমার পথে কোনো দিন বাধা দিইনি। আজও দেব না।

সুবিনয় বিবর্ণ মুখে বলে—এসব কি বলছ ইরা?

ইরা বলে—এ নিয়ে কোনো তর্কই করতে চাই না।

ইরা ও ঘরে চলে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। দুজনের মধ্যে এতদিন ধীরে ধীরে যে ব্যবধান গড়ে উঠেছিল আজ তার একটা চরম পরিণতিই ঘটলো।

সুবিনয় বলে—বিশ্বাস করো ইরা, এসব মিথ্যা। ওই মিঃ সোমের দলের হীন ষড়যন্ত্র।

বন্ধ দরজায় ওদিক থেকে কোনো জবাবই আসে না। সুবিনয়ের সব কথা যেন দেওয়ালে ধা খেয়ে ফিরে আসে।

ছোট শহরে ওই পোস্টার, লিফলেটগুলো একটা ঝড় তোলে। আর প্রফেসর সোম, প্রফেসর দাশ আরও দু'একজন সোমের দলের অধ্যাপকও ব্যাপারটা দেখে মনে মনে খুশী হয়।

সোম জানে এসব কার কারসাজি, কিন্তু সেটা যে খুব কার্যকর হয়েছে সেটা দেখে খুশীই হয়।

শীতলবাবু এই শহরের বড় ব্যবসায়ী।

এই দিকে কোন গ্রামে তার বাড়ি। সঙ্গতিপন্ন জোতদার। শহরে তার দু'তিনটে ধানকল, বিরাট পাটের আড়ত। সিমেণ্ট, লোহালক্কড়ের হোলসেল ডিলার। এতবড় লোক তবু সেই গ্রাম্যভাব যায়নি। কথাতেও এদিকের রাঢ় অঞ্চলের টান।

তার গদিতেও সেই পোস্টার লিবলেট পৌঁছে গেছে। শীতলবাবু দেখে শুনে বলেন—ইশব শালা খচরামি হে! কুন শালা আঙ্গুলিবাজি করেছে। নইলে সুবিনয়-বাবু তো এসব করার লোক নয়! কি হে ডাক্তার?

ডাক্তার নিবারণ সেন এখানের আদি ডাক্তার। এই অঞ্চলের শ্রদ্ধেয় মানুষ। শীতলবাবুর বাল্যবন্ধু! শীতলবাবু সকালেই এসব কথা শুনে এসেছে নিবারণবাবুর কাছে পরামর্শের জন্য।

শীতলবাবু বলেন—ওই সুবিনয়বাবুকে প্রিন্সিপ্যাল করায় এক দলের মত নাই, তারা কারা তাও খবর নিইছি। ওই সব কটা ফাঁকিবাজের দল। এইসব নোংরামি সেই শালাদের কাজ হে!

নিবারণবাবুও তেমনি কিছু অনুমান করেন। কারণ সেইটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। তবু বলেন—কিন্তু আমাদের হাতে তেমন কোন প্রমাণ এখনও নাই।

শীতলবাবু বলে—প্রমাণ টেনে বার করবো হে? এ্যাঁ—একটা ভদ্রলোকের মান-সম্মান নিয়ে খেলা করবে ওরা আর তাই মেনে লিব? ছোঁড়াকে পরোয়া করি না ওসব অন্ধকারে ঢিল হে। কলেজের জায়গা—টাকা বেশী দিইছে এই শেতল পাল, আমি ওই সুবিনয়বাবুকেই প্রিন্সিপ্যাল বানাবো। এই মিটিংয়েই। তাতে যা হয় দেখা যাবে।

নিবারণবাবু একটু বিচক্ষণ ব্যক্তি। সেক্রেটারী তিনিই—তিনি বলেন—ওটা

আমাদের সিদ্ধান্ত, কাজেও তাই হবে। কিন্তু এখন যখন একটা হুজুক উঠেছে, এখুনিই ওই সিদ্ধান্তটা নিলে শহরের মানুষকে ওরা উত্তেজিত করবে। কমিটির কিছু মেম্বার হয়তো অন্য কিছু ভাববে তাই এই মিটিং-এ আমরা সিদ্ধান্ত নেব না, তদন্ত করবো এই ব্যাপারে। সিদ্ধান্তটা নেব ক'দিন পর। এখুনিই হুট করে কিছু করা ঠিক হবে না। জনমত বলে একটা কথা আছে হে শীতল।

শীতল পালও ব্যবসাদার লোক। কখন কিভাবে চলতে হয় তা সেও জানে। তাই চুপ করে গেল।

তবু গজরায়—এসব ঠিক কাজ না। ছি ছি, ভদ্রলোকে এই সব কাজ করে?

উর্মিলা এই সমস্ত ঘটনায় ঘৃণায় রাগে আগুনে জ্বলে উঠেছে। মনে হয় ওই শয়তানদের দেখতে পেলে সমুচিত জবাবই দিত। কিন্তু তাদের কোন সন্ধান সে জানে না।

তবু মনে হয় তাকে নয়, সুবিনয়বাবুকেই তারা অপমানিত করতে চায়, তাই তাকেই হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে তারা।

এই চাকরীতে তার ঘৃণা এসে গেছে।

ফোন করেছে সে তোর হবুস্বামী ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোককে। সে বলে, এ সবের কাজ জানি। ওদের আমিই জবাব দেব, তুমি ওই চাকরী আজই ছেড়ে দিয়ে চলে যাও কলকাতায়, আমি গিয়ে দেখা করছি সেখানে।

উর্মিলা আজ নিজেই লজ্জিত।

তার জন্য সুবিনয়বাবুকে এইভাবে অপমানিত হতে হবে ভাবতেও পারেনি। তাঁর কাছে, বৌদির কাছে কি জবাব দেবে সে জানে না উর্মি।

তবু একটা সিদ্ধান্ত তাকে নিতেই হবে।

আর সেটা সে নেবে আজই, এখুনিই।

কলেজের কনফারেন্স রুমে গভর্নিং বডির মিটিং শুরু হয়েছে।

শীতলবাবু চেয়ারম্যান তাকে এখনও থামিয়ে রেখেছে নিবারণবাবু। অন্য মেম্বারদের মধ্যে কলেজের টিচারদেরও কয়েকজন আছে। প্রফেসর সোম প্রফেসর বোস এর মধ্যে গার্জেনদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দু'একজনকে হাত করেছে।

ওরা তৈরি হয়ে আছে। তারাই এই কলেজের অধ্যাপক ভাইস প্রিন্সিপ্যাল বর্তমানে এ্যাকটিং প্রিন্সিপ্যালের নামে ওই কুৎসার প্রসঙ্গ তোলে। তারাই বলে—আজ ওই প্রিন্সিপ্যাল নিয়োগের প্রশ্ন ওঠেনি। বরং সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক—সুবিনয়বাবু, যার নামে এত বড় অপবাদ উঠেছে, তাকে প্রিন্সিপ্যাল নির্বাচন করা হবে না। তার জায়গায় এই কলেজের অন্য কোন সিনিয়র প্রফেসারকেই নিয়োগ করা হোক।

এই কথাই আসবে তা জানতেন শীতলবাবু। আর কারা আনবেন তাও জেনেছিলেন। এখন তার সেই অঙ্ক মিলে যেতে শীতলবাবু বলেন—এর জন্যই ওই সব বাজে কথা রটানো হয়েছে সুবিনয়বাবুর নামে। আর সে সব কথা সত্যি না মিথ্যে, মিথ্যে হলে কারা করেছে এই কাজ এবার তদন্ত না হওয়া অবধি প্রিন্সিপ্যাল নিয়োগ করা বন্ধ থাকবে। যেমন চলছিল তাই চলবে।

প্রফেসর সোম আশা করেছিল তার কথামতই কাজ হবে। কিন্তু তা না হতে দেখে একটু অবাক হয়। তার দলের এক গার্জেন মেম্বার বলে—তাহলে চরিত্রহীন শিক্ষকই থাকবেন এখানে?

—কে চরিত্রহীন সেইটাই তদন্ত করা হবে তদন্ত। তারপর বিচার হবে। কাকের মুখে শুনে কারো দোষ সাব্যস্ত করা যায় না। তাতে যে গার্জেন-এর রুচিতে বাধবে তাদের বলবো তার ছেলেমেয়ে নিয়ে যান এই কলেজ থেকে। অন্যায় আর নীচ যারা দল পাকায় তাদের দরকার নাই এখানে। আমার বাপু সাফ কথা! না ভালো লাগে কেটে পড়ো। তাই বলে যে যা বলবে তা মেনে নোব না। কারণ কারা এসব বলেছে, করেছে তা জানি। আর কেন করেছে তাও এতক্ষণে জেনেছেন আপনারা। তাঁরা প্রিন্সিপ্যাল হবেন? হলেই হলো? শেতল পাল এখনও মরেনি।

হঠাৎ তারা চাইল। তাদের মিটিং-এ ঢুকছে ঊর্মিলা সেন। তাকে জড়িয়েই সুবিনয়ের নামে এইসব বিশ্রী রটনা করা হয়েছে।

শীতলবাবু একটু অবাক হয়—তুমি!

ঊর্মিলা বলে—আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে, তাই রেজিগনেশন লেটার দিতে এলাম।

ডাঃ সেন বলেন—সে কি! আমরা তো কিছু বলিনি!

ঊর্মিলা বলে—সেটা আপনাদের সৌজন্য। কিন্তু শহরে, এই কলেজেও এমন অনেক শিক্ষাব্রতী আছেন যাঁদের পেশা শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করা, মানুষের আদর্শ পাণ্ডিত্যকে হীন ভাবে আক্রমণ করা, যাতে শিক্ষার পরিবেশ এখানে না গড়ে ওঠে এই পরিবেশ থেকে সরে থাকতে চাই।

শীতলবাবু বলেন—তুমি চলে যাবে মা!

মেয়েটির অধ্যাপনার বিষয়ে তারাও শ্রদ্ধাশীল। তাই ওরা চায় না ঊর্মিলা চলে যাক।

ঊর্মি বলে—হ্যাঁ! যাঁকে জড়িয়ে অপবাদ দেওয়া হয়েছে উনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। তাঁকে অগ্রজের মতোই শ্রদ্ধা করি। এসব যে মিথ্যা—তারই প্রতিবাদে আমাকে আজই চলে যেতে হবে এখান থেকে। আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন। নমস্কার।

ঊর্মিলা দৃপ্ত ভঙ্গীতে চলে গেল।

স্তব্ধতা নামে কমিটি রুমে। ডাঃ সেন বলেন—আজ মিটিং বন্ধ থাক। সম্বন্ধে পরে আমরা সিদ্ধান্ত নেব।

ইরা স্কুলে গিয়ে দেখে এখানের পরিবেশ যেন দুদিনেই বদলে গেছে। স্কুলের দওয়ালে পোস্টার পড়েছে।

সহকর্মীরা দু'একজন তাকে দেখছে, ওদের চাহনিতে কি যেন রসিকতা, হয়তো াঙ্গই ফুটে ওঠে।

ইংরাজীর টিচার নীপা বোস আধুনিকা, সে বলে—তুমি ডাইভোর্স সুট করো রা। মহিলা সমিতি তোমাকে সমর্থন করবে।

ইরা উঠে গেল টিচার্স রুম থেকে। ওদের চাপা হাসির শব্দটা তার কানে াসে। সারা দেহমন জ্বলছে ইরার কি তীব্র জ্বালায়। ক্লাসে মেয়েদের মুখেও ন সে দেখেছে হাসির আভাস।

মুখ বুজে স্কুল সেরে কোনোমতে বের হয় ইরা।

সুবিনয় আজ নিঃসঙ্গ, একা।

ইরা তার বাইরের জীবন, শিক্ষার জগৎ, তার কাজ নিয়ে ভাবেনি। আজকের টিং-এ সুবিনয়ের উপর কলেজের ভার দেওয়া হয়নি। সুবিনয়ও আঘাত পেয়েছে। আঘাত, অপমান তাকে একাই সইতে হবে। ঊর্মিলাও আজ পদত্যাগ করে চলে ছে এখান থেকে।

সুবিনয় ইরাকে দেখে। মুখ গম্ভীর, থমথমে।

ইরা জবাব দিল না। নিজের ঘরে চলে গেল।

রাত্রি নেমেছে। ইরার সারা মনে আজ দুঃসহ জ্বালা। কোথাও সান্ত্বনার ন ঠাঁই নেই। এই বাড়িঘরও যেন বিষিয়ে উঠেছে। কি ভেবে ফোন করে মীরাকে। মীরার কাছে বোম্বাই এখন অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছে।

মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এমন একটা ব্যাপার আছে। জল যখন যে পাত্রে যায় তারই রূপ নিতে পারে সহজেই। মানুষ যে পরিবেশে এসে পড়ে—সহজে না হোক, কষ্ট করে ও সেই পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। মীরা প্রথম প্রথম এসে বোম্বাই এর পরিবেশে হাঁপিয়ে উঠেছিল এই ইঁদুর ড়ের জীবনে।

কিন্তু তার মনের মধ্যে সেই বেপরোয়া নারীমন ক্রমশঃ জেগে ওঠে। সেও র অতল থেকে জোর পায়। এই জীবনেই সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

তাই এগিয়ে চলে সেও।

এখন অনেক কিছুই বদলে গেছে মীরার। কলকাতার সেই মেয়েটির পোষাক-আশাক চালচলন আর চলাফেরায় এসেছে একটা স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য। নিজের মনে আত্মবিশ্বাসকে ফিরে পেয়েছে সে।

অফিসেও তার কাজের সুনাম বেড়েছে।

বুদ্ধিমতী, চটপটে আর ওর চেহারাটাও সাহায্য করছে তাকে সমাজের উপর তলার যাতায়াতের, মেলামেশার পাশপোর্ট পেতে।

এখন অফিসের কর্তাদেরও সুনজরে আছে।

আর মীরা এখন মডেলিং-এর কাজেও বেশ নাম কিনেছে। তার দরও অনেক!

মীরা এখন দিনরাত ব্যস্ত। টাকাও ভালো রোজগার করে।

রাতের বেলায় ফ্ল্যাটে ফিরেছে সেদিন। শুতে যাবে। ফোনটা বাজতে তুললো কলকাতা থেকে ইরা ফোন করছে।

মীরা বলে—তুই! কি খবর? সব ভালো তো!

আজ ইরার মনে ঝড় বইছে। কোথাও তার সান্ত্বনার ঠাঁই নেই। তাই যে মীরাকেই ফোন করেছিল।

বলে ইরা, জীবনে আজ নিদারুণ ভাবে ঠকে গেছি রে! সব স্বপ্ন আমার ব্যর্থ হয়ে গেল, মীরা।

মীরা অবাক হয়—সেকি রে?

ইরা আজ কান্না-ভিজে স্বরে মীরাকে জানায় তার সর্বনাশের কথা।

মীরা সব শুনে কি ভাবছে।

ইরা বলে—এখানে, এই বাড়িতে আর থাকা যাবে না রে! এই ঘরে আমার দ বন্ধ হয়ে আসছে! চলে যেতেই হবে সব ছেড়ে। যা মিথ্যা হয়ে গেল—তাকে আঁক ধরে বাঁচার কোন চেষ্টাই করতে চাই না।

মীরা এখন জীবন সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞ। ইরার বিপদের কথায় তাই ভাবছে। বলে মীরা—দূর পাগলি। ঘর সংসার করতে গেলে এমন হয়। এ নি এত ভাবছিস কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে।

ইরা বলে—না রে! আমার মন ভেঙে গেছে। ভাঙা মন আর জোড়া লাগ না রে! চলে যেতেই হবে আমাকে।

মীরা ওকে কাঁদতে শুনছে। মনে হয় ব্যাপারটা গুরুতরই হয়ে উঠেছে।

তবু বলে মীরা—ওসব ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে ফ্যাল। ও কিছুই নয়! কিছুদিনের জন্য তুই এখানে আমার কাছে চলে আয়। ভালো লাগবে। ওখ বন্দী থেকে আর সংসারের ঘানি টেনে এইসব নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়েছে। চলে বোম্বাইএ। দিনকতক ছুটি নিয়ে ঘুরবো।

কি ভাবছে ইরা।

মীরা বলে—তাহলে কলকাতায় আমাদের ট্রাভল এজেন্টকে বলে দিচ্ছি। যে

ঠিকানায় গিয়ে তোর এয়ার টিকিট দিয়ে আসবে। ওখানের প্লেনে উঠলে সোজা বোম্বাইএ এসে নামবি। দিনকতক ঘুরে যা এখানে—হুট করে কিছু করবি না। ছেলে মেয়ে সংসার আছে তোর। মাথা গরম করিস না। চলে আয় এখানে।

ইরাও যেন এই আহ্বান এড়াতে পারে না।

মীরা বলে—তাহলে আসছিস তো!

ইরাও কি ভেবে মত দেয়—তাই যাবো ভাবছি।

ইরাও যেন আজ মুক্তি পেতে চায় এখান থেকে।

এতদিনের সংসার, অনেক মায়া-মমতা নিয়েই সে গড়ে তুলেছিল। কিন্তু নিমেষের মধ্যেই সব যেন মিথ্যায় পরিণত হয়েছে।

আজ তাই সরেই যাবে ইরা এখান থেকে।

এই শহরের সমাজও আজ তাকে যেন ব্যঙ্গের চোখেই দেখে। স্কুলে শুনতে হয়েছে বান্ধবীদের কৌতূহল-চাপা প্রশ্ন। শুনেছে স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যেও নীরব গুঞ্জরণ।

সবচেয়ে অপমানিত বোধ করেছিল ইরা কাল তার ছাত্রীর বাড়িতে। শহরের এক গুড়ের আড়তদার ভদ্রলোকের মেয়েকে বাড়িতে টিউশানি করতো। টাকা ভালোই দিত তারা।

পুরানো বাড়ি। আর ওদের বাড়িতে এখনও পর্দার ব্যাপারটা আছে। অন্তঃপুরে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ। জাঁদরেল গিন্নীই সংসারের কর্ত্রী। লেখাপড়ার বালাই নেই তবু সেইই তদারক করে মেয়ের লেখাপড়ার। পড়বার সময় মাষ্টারনীর গলা না পেলে এসে উঁকি মারে, মাস্টারনী ফাঁকি দিচ্ছে কিনা তাই দেখে। মাইনে দেবার সময় বলে—মুঠো মুঠো টাকা দিচ্ছি বাছা, ভালো করে পাশ করাতে হবে মেয়েকে।

মেয়ের বর্ণও মায়ের মত, পাকাজামের মত টুকটুকে কালো আর খেয়ে-দেয়ে দেহে চর্বি যা জমেছে তাও প্রচুর। মুখ চোখ দেখা দেখা যায় না, শুধু মেদের মনাক।

সেদিন স্কুল থেকে গেছে ছাত্রীর বাড়ি। মন মেজাজ ভালো নেই ইরার। সেই বে পোস্টার লিফলেট নিয়ে আলোচনা চলছে সহরে।

ছাত্রীর বাড়িতে ঢুকে দোতলায় উঠে যাবে ইরা, ছাত্রীর ঘরে নীচে কঠিন কণ্ঠস্বর শুনে চাইল।

ছাত্রীর মা বিশাল দেহটা নিয়ে হেলতে দুলতে এসে বলে—আর পড়িয়ে কাজ নাই বাছা।

চাইল ইরা!

মহিলা বলে—যা সব কুচ্ছো-কেচ্ছা শুনছি, ছি ছি! যে মেয়ে নিজের সোয়ামীকে আটকাতে পারে না সে আর কি শিক্ষে দেবে বাছা! তারও নির্ঘাৎ চরিত্তর দোষ আছে। না হলে সোয়ামী বিগড়ে যায়?

ইরা চমকে ওঠে।—কি বলছেন এসব কথা।

মহিলাও বেশ শানানো গলায় বলে—রাগ করোনি বাছা! বড় গলা করে বলছি না—আমরাও ঘর সমসার করি। কই, যাক তো ঘরের মানুষ অন্য মেয়ের কাছে? ঘাড়ে মাতা রাখবোনি তাহলে! বুঝলে, নিজে ঠিক থাকতেন তবে তো সতীত্ব! তোমার পাওনা-গণ্ডা বুঝে নে যাও বাপু, আমি অন্য মাস্টারনী দেখবো! তোমাকে দে হবে না।

রাগে অপমানে ইরার মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে। বের হয়ে এল সে ওই বাড়ি থেকে।

জীবনে এরকম অপমানিত কখনও হয়নি সে।

সুবিনয়ও ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না। এতবড় একটা কান্ড এত সহজেই ঘটে যাবে তা ভাবতেও পারে নি।

ঊর্মিলার কাছে ক্ষমা চাইবার মুখ তার নেই।

ঘৃণায় লজ্জায় অপমানে অধীর হয়ে ঊর্মিলা এখানের চাকরী ছেড়ে চলে গেছে।

তার সংসারেও একটা মিথ্যাকে অবলম্বন করে যে এতবড় বিপর্যয় ঘটে যাবে ত ভাবতেও পারেনি সুবিনয়। দেখছে ইরাও সরে গেছে তার কাছ থেকে। এক বাড়িতে থাকে তবু দুজনের মধ্যে নীরব ব্যবধান বেড়েই উঠেছে।

মুখবুজে ইরা সংসারের কাজ করে। কিন্তু আগেকার মত সেই হাসি-খুশি আনন্দ-উচ্ছল ভাবটা আর নেই।

সেদিন সকালে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে ইরা বলে সুবিনয়কে—কিছু দিনের জন্য চলে যাচ্ছি এখান থেকে। এবাড়িতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

সুবিনয় চাইল তার দিকে। এখন তার মনেও ঝড় চলেছে। সুবিনয়ের জীবনে একটা মিথ্যা অপবাদ তার সব সুনামকে বিপন্ন করেছে। এ সময় ইরাকে তার পাশে দরকার।

কিন্তু ইরা চলে যেতে চায়।

সুবিনয় কোনদিন কারো কাছে কিছুই চায়নি। নিজেই নিজের ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে নিজের বর্তমান জীবন গড়েছে।

তাই আজ ইরার কথাগুলো চুপ করে শোনে।

শুধোয় কোথায় যাবে?—মীরার কাছে, বোম্বাই-এ কালই মর্নিং ফ্লাইটে যাচ্ছি ওর ট্রাভেল এজেন্ট টিকিট দিয়ে গেছে।

সুবিনয় অবাক হয়। ইরা তাহলে সব আয়োজন করেই ফেলেছে। এখন বাধা দেবার প্রশ্নই ওঠে না।

তাই সুবিনয় ওকে বাধাও দিতে চায় না।

ইরাও বাধা না পেয়ে যেন নিশ্চিন্ত হয়। বলে ইরা—শুভা বিমু রইল। বনমালীদাকেও সব বলে যাবো।

সুবিনয় তবু শুধোয়—কবে ফিরবে?

ইরা তা জানে না। বলে সে—আগে যাই তো বোম্বাই-এ। তারপর দেখা যাবে।

সুবিনয় কি ভাবছে।

ইরাও আজ বদলে গেছে। আজ ইরাও বোধহয় ভেবেছে তার নামে ছড়ানো অপবাদগুলো হয়তো সত্যিই। এ নিয়ে সুবিনয় নিজের স্ত্রীর কাছে কোন সাফাই গাইতে চায় না। শুধু তার দুঃখ হয়, ইরাও তাকে ভুল বুঝলো। কিন্তু করার কিছুই নাই।

তবু সুবিনয় বলে—আমার জন্য বলছি না। শুভা, বিমুর কথাও ভাববে তো!

ইরা আজ যেন সব কিছুকেই এড়াতে চায়। এই সংসারই তার কাছে বিষিয়ে উঠেছে। বলে ইরা—এতদিন আমিই সব দেখেছি, সয়েছি। কিন্তু আমার সহ্যেরও সীমা আছে। তাই সরে থাকতে চাই।

কথাগুলো বলে ইরা উঠে যায়। নিজের চোখেও জল আসে। ওই সুবিনয়ের সামনে সে তার এই দুর্বলতাকে প্রকাশ করতে চায় না।

তবু দমদম এয়ারপোর্টে এসেছে সুবিনয় শুভা বিমুকে নিয়ে। ইরাও শুভা বিমুকে আদর করে। ওদের জানাতে দিতে চায় না তাদের দুজনের ব্যাপারটা।

শুভা বলে—গিয়ে ফোন করবে মা?

বিমু শোনায়—আসার সময় আমার জন্য বোম্বাই থেকে একটা ভালো বন্দুক আনবে মা।

প্লেনের সময় হয়ে গেছে। যাত্রীদের সিকিউরিটি চেকের জন্য ডাক পড়ছে। ইরা ছেলেমেয়েকে আদর করে ভিতরে চলে গেল।

প্লেনটা টেক অফ করছে।

ইরার চোখে জল আসে। নীচে দেখা যায় কলকাতা শহরের বাড়ি ঘর—রাস্তা, গঙ্গার রেখা।

প্লেনটা আকাশে উঠে গেল।

ইরা আজ যেন তার মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। জীবনের সব দুঃখ বেদনাকে ভুলে গিয়ে সে আবার নতুন করে বাঁচবে।

ঘণ্টা দুয়েক কোনদিকে পার হয়ে যায় জানে না, বিমানসেবিকার কণ্ঠস্বর শোনা যায়—আমরা বোম্বাই-এর সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরে নামতে চলেছি। যাত্রীদের সিট বেল্ট বেঁধে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

নীচে দেখা যায় নতুন শহরের ঘরবাড়ি, জলাভূমি—পাহাড়। প্লেনটা নীচের দিকে নামছে।

বিচিত্র বোম্বাই শহরে এসে ইরা যেন আর এক জীবনের স্বাদ পায়। কলকাতার শহরতলীর সেই কঠিন জীবন, মাপা পয়সার হিসাবের জীবন, সেকেলে মধ্যবিত্ত পরিবারের হাঁড়ির খবর, তুচ্ছ সংস্কারের বেড়ায় বন্ধ এ জীবন নয়। এখানে আছে

প্রাচুর্য—মুক্তির সন্ধান। স্বাধীনতার স্বাদ।

আরব সাগরের ধারে বিশাল বাড়ির ছতলার উপর সাজানো ফ্ল্যাট, আধুনিক জীবনের সব উপকরণই আছে। কালার টি. ভি, ভি. সি. আর.এ মনের মতো ছবি দেখা যায়, বাথরুমে বাথটব গীজার—সবই আছে। বিদেশী পারফিউম, সাবান—বিলাসের উপকরণের কোনো ত্রুটি নেই।

অবাক হয় ইরা। বলে—এ যে রাজরানীর মতো বাস করছিস মীরা!

মীরা বোনের দিকে চাইল। সকালেই স্নান সেরে ড্রায়ার দিয়ে ভিজে চুল শুকুতে শুকুতে বলে মীরা—বাইরের জীবনটাকেই দেখলি। এর ভিতরটা একেবারে শূন্য—ফাঁপা রে। চোখ ভরে, মন ভরে না।

ইরা দেখছে ওকে। মীরা বলে—ব্রেকফাস্ট করে অফিসে বের হতে হয়, লাঞ্চ ওখানেই। বাড়ি ফিরে একা, না হয় সেই পার্টি! বুঝলি—এ জীবনে হাঁপিয়ে উঠেছি রে। মনে হয় কোথাও পালাই।

ইরা বলে—ছাড় তো বাজে কথা।

মীরা ঘড়ির দিকে চেয়ে ফ্রুটজুস-এর গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বলে—

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।

কিন্তু আসল সুখ কোথায়, তার সন্ধান কেউই জানে না রে। চলি—আজ বিকালে ফিরে তোকে নিয়ে বের হবো।

মীরা বের হয়ে গেল, গাড়ি এসে গেছে। বের হয়ে যায় মীরা।

ইরা দেখছে মীরাকে।

আজ ওর জীবনের প্রাচুর্য, মুক্তিকে সে মনে মনে হিংসা করে। ভি. ডি. ও.-তে একটা বিদেশী ছবি চালু করে ইরা সেই ছবির ক্যাবারে নাচের দৃশ্যটা দেখছে মন দিয়ে।

হঠাৎ কলিং বেলটা ডিংডং সুরে বেজে ওঠে।

ইরা দরজা খুলে একটি তরুণকে দেখে চাইল। মুখটা চেনা। মীরার অ্যালবামে এর ছবি দেখেছে। মীরাও বলেছে মিঃ লালের কথা।

ইরা বলে—মিঃ লাল!

মিঃ লাল বলে—ভেবেছিলাম তোমার দেখা পাবো না মীরা!

ইরা চমকে ওঠে, ওর কথায়। সহজ ভাবেই।

মিঃ লাল তাকে মীরাই ভেবেছে। এতটুকুও ধরতে পারেনি।

ইরা কি খেয়াল বশেই বলে—অফিস বেরুই নি!

মিঃ লাল বলে—মাঝে মাঝে ছুটিছাটা নাও মীরা। যা পরিশ্রম করো। হ্যাঁ—আজই জরুরী কাজে মাদ্রাজ যেতে হচ্ছে এগারোটার ফ্লাইটে। যাচ্ছিলাম এয়ারপোর্টে—ভাবলাম খবরটা দিয়ে যাই। মিঃ কুমারের মডেলিংটা করে দিও। এসে কথা হবে। বাই—

মিঃ লাল বের হয়ে গেল।

ইরা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

তার মাথায় তখনও ঘুরছে কথাটা। ইরা আর মীরা যমজবোন। এক রকমই দেখতে। সহজে তাদের পার্থক্যটা ধরা পড়ে না আজও। ইরা যেন মনে মনে মীরাতেই পরিণত হয়ে গেছে।

স্বপ্ন দেখে ইরা—এইখানের মুক্ত পরিবেশেই থাকবে সে এই নতুন জীবনে, এখানেই সে শান্তি পাবে। ওই পুরানো ঘর, সুবিনয়—তার সংসার সবকিছুর কথাই যেন ভুলে যেতে পারবে সে। এখানেই সুখ-শান্তিতে থাকবে। আজ মিঃ লাল এর এই চেনাটা ইরাকে ভাবিত করেছে এইভাবে।

এই পরিবেশে আসেনি এর আগে ইরা। কলকাতায় তার জীবন ছিল খুবই ছোট্ট পরিধির মধ্যে সীমিত। আজ মিঃ লাল-এর ওই ব্যবহারটা ইরার মনে এক নতুন ভাবনা এনেছে। মীরার এত ঘনিষ্ঠ ওই ভদ্রলোক, তবু ইরাকে সে মীরা ভেবেই ভেবেছে।

সন্ধ্যার পর বোম্বাই শহর আলোর মালায় সেজে ওঠে। সমুদ্র, পাহাড় আর আকাশছোঁয়া বাড়ির আলোর সাজ সব মিলে যৌবনবতী হয়ে ওঠে বোম্বাই শহর। হোটেলে শুরু হয় রাতের জীবন।

মীরার সঙ্গে বের হয়েছে ইরা। বাইরেই খেয়ে নেবে।

সমুদ্রের ধারে বিরাট হোটেলের ঘূর্ণায়মান রেস্তোরাঁয় বসে দেখছে ইরা অবাক হয়ে তার চারপাশের মানুষজনদের। মেয়েরাও এখন বাধাবন্ধনহীন।

মীরা কোথায় গেছে ওদিকে। ইরা কার ডাকে চাইল—হাই মীরা।

ইরা চমকে ওঠে।

দামী স্যুট ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বলে—সেদিন এত বড় কাজটা করে দিলে—মু তার জন্য কিছু প্রেজেন্ট পাঠালেন তোমায়। প্লিজ—

একটা প্যাকেট এগিয়ে দেয় ওর হাতে।

ইরা সেটা হাত বাড়িয়ে নেয়।

—থ্যাঙ্ক ইউ। পরে দেখা হবে।

ইরাকে কোন কথা বলার বা কিছু প্রশ্ন করার অবকাশ না দিয়েই বের হয়ে গেল লোক।

ইরাও রীতিমত বিস্মিত হয়, দেখেছে সে চলে গেল ভদ্রলোক। তার মাথা জোড়া কটা দেখা যায়।

ইরা ছোট্ট প্যাকেটটাকে ব্যাগে রেখে মীরার সন্ধান করছে, দেখা যায় ওদিকে রা দুতিনজন লোকের সঙ্গে হেসে কথা বলছে।

গাড়িতে ফিরছে ওরা। ইরা ব্যাগ থেকে সেই প্যাকেটটা বের করে বলে—ভদ্রলোক, বেশ চকচকে টাক—এই প্যাকেটটা আমাকেই মীরা ভেবে দিয়ে

গেল। কি একটা প্রেজেন্ট আছে, তাদের কি কি কাজ করেছিলি তাই—

মীরা একটু অবাক হয়। শুধোয়—টাকওয়ালা ভদ্রলোক—

—হ্যাঁ, নে এটা।

মীরা যেন একটু গম্ভীর হয়ে যায়।

প্যাকেট নিয়ে খুলতে দেখা যায় একটা দামী নেকলেস।

চমকে ওঠে ইরা। দামী গহনাপত্র তার নেই তেমন। ইরা বলে—অনেক দাম রে?

মীরা সে বাক্সটা ওর হাতে দিয়ে বলে—তোকে দিয়েছে, এটা তোরই।

ইরা অবাক হয়, খুশিও হয়। দেখছে সে হারটাকে। একটা বড় ডায়মন্ড সেট করা হার।

ইরা শুধোয়—তাদের কি কাজ করে দিয়েছিলি রে মীরা?

মীরা যেন ব্যাপারটাকে এড়াবার জন্যই বলে—ইয়ে, একটা মোটা টাকার এক্সপোর্ট অর্ডার পাইয়ে দিয়েছিলাম।

ইরা কি ভাবছে।

ফ্ল্যাটে ফিরেও ইরার মনে এই নতুন জীবনের ছবিটাকে ভুলতে পারে না। এই বিলাস, প্রাচুর্য আর এই সমাজের জীবনযাত্রা তার শান্ত মনে কি আলোড়ন এনেছে। ইরা ক্রমশঃ যেন বোম্বাই শহরের এই জীবনকে ভালবেসে ফেলেছে। এটা যেন নেশার মতই।

এই উচ্ছল, প্রাচুর্যভরা জীবনে আছে মুক্তির স্বাদ।

তার অতীতের শান্ত স্তিমিত একঘেয়ে জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সেখানে কয়েকটা অর্থহীন মিথ্যা কাগজের পোস্টার তাদের জীবনকে তছনছ করে দিয়েছে। এত সংকীর্ণ সেই জীবনে সে ফিরে যেতে চায় না। মীরা তার তুলনায় অনেক ভাল আছে। কোন অপমানের গ্লানি কেউ ছড়ায় না। এরা অনেক উদার।

সেদিন কিছু কেনাকাটা করতে হবে।

মীরা বলে—ইরা, চল আমার অফিসে। আজ সকাল সকাল বের হয়ে মার্কেটিং সেরে ফিরব।

বান্দ্রা বলতে গেলে মূল বোম্বাই শহরের উপকণ্ঠে। এখান থেকে বোম্বাই-এর মূল শহর বেশ একটু দূরে।

গাড়িতে যেতে অসুবিধা নেই। কারণ কলকাতা শহরের মত যখন-তখন যানজটের সমস্যা নেই। গাড়ি অনায়াসেই চলতে পারে।

ফোর্ট এরিয়ায় ওদের বিরাট অফিস।

মীরা ইরাকে নিয়ে লিফটে সাততলায় উঠে বিরাট হলঘর পার হয়ে নিজের চেম্বারে এসে ঢুকলো।

হলঘরের ঝকঝকে পরিবেশে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে কাজ করছে। উজ্জ্বল

ফ্লোরেসেন্ট আলোয় ঝকমক করছে সব কিছু। ওদিকে সারবন্দী চেম্বার। তার একটা মীরার জন্য নির্দিষ্ট।

ইরা দেখছে সবকিছু।

এই পরিবেশে কর্মব্যস্ততার মাঝে সে যেন এদেরই একজন হয়ে গেছে। তারও ইচ্ছা হয় এখানে যদি কোন কাজকর্ম পায় কোন অফিসে, সে থেকেই যাবে। আর সংসারের আবর্তে ফিরে যাবে না।

মীরার চেম্বারটাও বেশ ঠাণ্ডা। সারা হলই সেন্ট্রালি এয়ারকনডিশনড্। বেশ ঠাণ্ডা পরিবেশ। মীরা বলে—বোস।

ফোনটা বেজে ওঠে। টেবিলে দু তিনটে ফোন। তারই একটা বাজছে। মীরা তুলে নেয়। কি কথা বলে ফোন রেখে বলে—ইরা তুই বোস। আমি এম. ডি.-র ঘর থেকে আসছি।

বের হয়ে যায় মীরা।

ইরা একাই রয়েছে চেম্বারে।

কি ভেবে সে এবার মীরার চেয়ারেই বসে। নরম ফোমের চেয়ারটা বেশ আরামদায়ক। ইরা যেন স্বপ্ন দেখে সেইই বসেছে এখানে। মীরার হাত থেকে অতীতে ওই সুবিনয়কে সরিয়ে নিয়েছিল। এবার মনে হয় এই চেয়ারটা ওর হাত থেকে সরিয়ে নিতে পারলে আরও সুখী হবে ইরা।

গম্ভীরভাবে কি কাগজপত্র দেখছে ইরা।

হঠাৎ সুইং ডোর খুলে কাকে ঢুকতে দেখে চাইল।

মীরা নয়, এ অন্য এক ভদ্রলোক। হাতে কি ফাইল।

ভদ্রলোক বলে—ম্যাডাম সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাইলটা এসেছে। সেদিন চেয়েছিলেন। আর কি কি আউটস্ট্যান্ডিং আছে তাও দেখে নোট দিয়েছি। আপনি একটু চেকআপ করে দিলে জবাব দিয়ে দেব স্টোর ডিপার্টমেন্টকে। ব্যাপারটা খুব কনফিডেনসিয়াল। গোপনীয় কিন্তু।

ইরা দেখছে ভদ্রলোককে। ভদ্রলোক ফাইলটা খুলে কি দেখায়। বলে সে, এটা রেখে গেলাম, দেখে পাস করে দেবেন।

ফাইলটা রেখে চলে যায় সে।

ইরাও অবাক হয়।

সেদিন মিঃ লাল তাকে ফ্ল্যাটে মীরা বলেই জেনেছিল। সেই সন্ধ্যাবেলায় হোটেলেও সেই ভদ্রলোক তাকেই মীরা বলে তার হাতে এত দামী নেকলেসটা দিয়ে গেছিল। আজ দিনের আলোয় এই ভদ্রলোকও তাকে দেখে মীরাই ভেবে এই ফাইলপত্র দিয়ে চলে গেল। এতবড় গোপনীয় ফাইল এভাবে তার হাতে তুলে দিয়ে গেল নিশ্চিন্তে।

ইরা আয়নার দিকে চেয়ে দেখছে নিজেকে। মীরাকেই যেন দেখছে সে। হাসছে।

মীরা ঢুকে অবাক হয়—কিরে ?

ইরা বলে—তোর অফিসও জেনে গেছে আমাকে মীরা বলেই। ইরার বদলে আমি এখন মীরাতেই পরিণত হয়েছি।

হাসে মীরা। বলে—চল। মার্কেটিং শেষে একটা পার্টিতে একটু থেকে ফিরবো ফ্ল্যাটে! ওদের পার্টিবাজিতে না গেলেই গুডবুক থেকে নাম মুছে যাবে।

মীরার এই পার্টির জীবনে যেন ক্লান্তি এসে গেছে। কোন ফাইভ স্টার হোটেলের লনে পার্টি চলেছে। পুরুষ নারীর জটলা। ইরাও এসেছে।

—হাই মীরা।

ইরাকে সেও মীরাই ভেবেছে! ইরা উচ্চহলহাসিতে মুখ রাঙিয়ে মাথা নাড়ে!

এখন সে বেশ কিছু পার্টির এটা ভদ্রতাও রপ্ত করেছে। হুইস্কি খেতে ভয় করে তার। আর একটা 'জুস' এর গ্লাস নিয়েই ঘোরে।

মিঃ লাল, সেদিনের সেই ভদ্রলোকও এগিয়ে আসে।

বলে মিঃ লাল, এত দেরী করে এলে মীরা ?

ইরাও চিনেছে ভদ্রলোককে। সেদিন ওদের ফ্ল্যাটে গেছল! আজও সে ইরাকেই চিনেছে মনে করে। সাহস করে ইরা বলে—সেদিনের পর আর দেখাই নাই!

মিঃ লাল বলে—ভেরি সরি মীরা। ক'দিন খুব ঝামেলায় আছি। আজও বাইরে যেতে হচ্ছে। সামনের সপ্তাহে ফিরে দেখা করবো। গুড নাইট।

মিঃ লাল বের হয়ে যায়।

ইরা আজ ওদের চোখে যেন সত্যি মীরাতে পরিণত হয়েছে। ওদের অনেকের এই স্তাবকতাও ভালো লাগে ইরার! তার মনে যেন কোন নতুন সত্তাই জন্ম নিচ্ছে।

মীরা পার্টিতে এসে লনের এক কোণে চুপচাপ বসেলিল। সমুদ্রের হাওয়াটা বেশ ভালো লাগছিল।

এই পার্টি, চাকরী, মডেলিং-এর কর্মব্যস্ত জীবনে তার নিঃসঙ্গ মন যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। ইরা ওই দিকের ভিড়ে মিশে আছে।

মীরা তাকে খুঁজে নিয়ে বের হলো। তখন বেশ রাত্রি হয়ে গেছে।

অবশ্য বোম্বাই-এর জীবনে রাত্রির স্থায়িত্ব বেশ কম! এখনও পথে গাড়ি চলাচল করছে। হোটেলের বাইরে ট্যাক্সিওয়ালারা আছে অনেকে। রাতেও খদ্দেরের অভাব হয় না এই নিশাচর জগতে।

ইরা আবার খুশীর স্বপ্নে যেন ডুবে আছে। ওর পোশাক-আশাকেও আমূল পরিবর্তন এসেছে।

ফ্ল্যাটে ফিরে মীরা পোশাক বদলে হাতমুখ ধুয়ে খেতে যাবে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে ইরা চুলের বিনুনী বাঁধছে।

ইরা বলে—ভাবছি বোম্বাইএ থেকে যাবো। একটা কাজকর্ম কিছু জুটিয়ে নিয়ে। বাড়ির সেই পরিবেশে আর ফিরতে ইচ্ছা হয় না। চাকরী পেলে ছেলে-

মেয়েদের এখানেই আনিয়ে নেব—

কথাটা শুনে মীরা অবাক হয়।

ইরা বলে—এখানেই একটা কাজকর্ম দেখেশুনে দে মীরা, তোর তো অনেক চেনা জানা। এখানেই থাকবো।

অবাক হয় মীরা—সে কি! তোর ঘর-সংসার, স্বামী-ছেলে মেয়ে রয়েছে—

—ওই জীবনে আর ফিরতে চাই না রে। এতটুকু শান্তি নেই সেখানে। মনে হয় সংসার করে, ঘর বেঁধে ঠকেছিই। কিছুই পাইনি।

মীরা দেখছে ইরাকে।

মীরা বলে—এই জীবনের বাইরে অনেক আলো, প্রাচুর্য, কিন্তু এর অন্তরালে আসল জীবনে কিছুই নেই রে, আছে শুধু হাহাকার, শূন্যতা আর জ্বালা। আমি ঠকেছি রে! তুই ঘরে ফিরে যা—সেখানেই শান্তি পাবি!

ইরা বলে—তুই শান্তি পাসনি?

মীরা হতাশাভরা কণ্ঠে বলে—না রে! বড় অশান্তি এখানে। এ জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে। পথ পেলে সরে যেতাম এই জীবন থেকে।

ইরা বলে—পথ আছে!

—মানে! মীরা অবাক হয়।

ইরা বলে—তুই ওই সংসারে যা—ইরা হয়ে যাবি। আর আমি এখানে মীরা হয়ে থাকছি।

মীরা বলে—মাথা খারাপ হয়েছে তোর ইরা?

ইরা বলে—চিরকালই ঝুঁকি নিয়েছিস, আরও একটু না হয় নিলি ওই শান্তি পাবার সন্ধানে। কেউ ধরতে পারবে না।

—এখানেও মীরা হয়ে গেছে ইরাই। ইরার সংসারে মীরাই এবার ইরা সেজে চলে যাবি! দ্যাখ না কদিন, তারপর গোলমাল বুঝলে যে যার নিজের জায়গায় ফিরে যাবো। মনে কর এও একটা স্পোর্টসই। তুই তো বরাবরই স্পোর্টসম্যান ছিলি, এটুকু ঝুঁকি নিতে পারবি না?

ইরাও আজ যেন এখানে এসে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

মীরা কি ভাবছে।

কিছুদিন এই গতিবেগে ভেসে যাওয়া জীবন থেকে মীরাও যেন ছুটি পেতে চায়। একটি ছোট্ট ঘর, ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনাস্বাদিত সংসারী জীবনের ছোঁয়া পেতে চায় তার মন। তবু ভয় হয় তার। শুধোয়—সুবিনয়দা যদি ধরে ফেলে!

ইরা বলে—ভয় নেই। আমরা ক'মাস ধরেই আলাদা ঘরে থাকি দূরে দূরেই।

মীরা যেন কোলকাতার ছোট্ট ঘরের স্বপ্ন দেখছে। ইরা বলে—কি রে, ভয় পেলি নাকি?

মীরা বলে—নিজের জন্য নয়, তোর জন্য ভয় হয় রে। এখানের জীবন তোর ধাতস্থ হয়নি। এ জীবন তোর জন্য নয় রে। যদি কিছু গোলমাল হয়ে যায়!

ইরা বলে—ধাতস্থ হয়ে যাবে। আমার জন্য ভাবিস না। তুই কলকাতায় যা—আমি ঠিক চালিয়ে নেব এখানে। কেউ ধরতে পারবে না। দ্যাখ না খেলাটা কেমন জমে—

মীরা ভীতকণ্ঠে বলে—এ আগুন নিয়ে খেলার মতোই রে ইরা।

ইরা বোনকে জড়িয়ে ধরে বলে—পাগল তুই। যা বললাম কর।—প্লীজ! লক্ষ্মী মীরা!

মীরা বলে—ঠিক আছে। ফোন করবি কোনো অসুবিধা হলে। সাবধানে থাকবি।

ইরা বলে—এত ভয় পাচ্ছিস কেন। দেখবি ঠিক চলবে সব কিছু। আমি চিঠি লিখেছি কলকাতায়, ফিরে যাচ্ছি। যাবি কিন্তু তুই!

মীরা অবাক হয় ইরার কথায়।

বোম্বাই শহরে এসে ওর ছোট বোন যেন একেবারেই বদলে গেছে। ইরার বাইরে শান্ত একটা শ্রী আছে সত্যি। কিন্তু ওর মনের অতলে আছে একটা কাঠিন্য, জেদ। সেই জেদের বশেই ইরা সুবিনয়ের দিকে এগিয়ে গেছিল। আবার সেই জেদের বশেই সেই সংসার ছেড়ে বোম্বাই এসে নতুন করে বাঁচতে চায়।

মীরা যে জীবনের অন্তঃসারশূন্যতাকে আবিষ্কার করে ক্লান্ত, আজ ইরা সেই জগৎকে মেনে নিয়ে এখানে থাকতে চায়!

মীরা বলে—এ তুই ভুল করছিস ইরা। এখনও ভেবে দ্যাখ।

ইরা বলে—না রে, তুই কি ভয় পেলি?

মীরা ভয় পায়নি, প্রতিটি মেয়ের মনের গভীরে ঘরের একটি নীরব আকাঙ্ক্ষা থাকে। ঘরের স্বপ্ন দেখে সে একান্তে।

মীরাও যেন আজ সেই স্বপ্ন দেখছে।

সুবিনয়ের কথা মনে পড়ে। ইরার ছেলেমেয়েদের কথা। একটি সাজানো সংসারের অধিকার পাবে সে, ঝুঁকি আছে—ওদের মন চোখকে ফাঁকি দিতে হবে।

মীরা কি ভাবছে। এ যেন এক বিচিত্র খেলা।

ইরা বলে—আমি যদি তোর এই জীবনে মিশে যেতে পারি তুই কেন পারবি না?

মীরা বলে—তা নয়, কিন্তু যদি কোনদিন লুকিয়ে তোর ছেলেমেয়েরা জানতে পারে?

—তার আগেই যে যার জীবনে ফিরে যাবো। কোন সমস্যাই হবে না।

মীরা বলে—তবু বলি, ঘর সংসার ফেলে আসবি? শান্তির জায়গা ছেড়ে?

ইরা বলে—এত যদি শান্তির ডিপো বলে জানিস সংসারকে—যা না সেখানে, একটু শান্তির নমুনাই দেখে আয়। আমি চিঠি দিচ্ছি কলকাতায়—যে ফিরে যাচ্ছি। তুই কিন্তু যাবার জন্য তৈরী হ। দরকার হয় আমিই তোকে সংসারের ব্যাপারে তালিম দিয়ে দেব।

মীরা ভাবছে কথাটা। তার মধ্যে যেন একটা লোভী মন জেগে উঠেছে। ভাবছে, তাকেও তালিম দিতে হবে ইরাকে—অফিসের ব্যাপারে।

সুবিনয় শূন্যঘরে বিপদেই পড়েছে। শুভা বিমুর মনেও শান্তি নেই। আর বনমালী একা সংসার সামলাতে হিমশিম খায়। কাজের লোকটাকেই বকাঝকা করে।

শুভা বলে—ব্রেকফাস্ট কই, স্কুলের দেরি হচ্ছে!

বিমু কোথায় কি বের করতে গিয়ে আলনাসুদ্ধই আছড়ে ফেলে ছত্রাকার করে। সুবিনয়ের চশমা-কলমও ঠিক থাকে না। খেতে বসে দ্যাখে—ডালে নুনই নেই. মাংস নুনে পুড়ে গেছে।

—কি দেখিস তুই? সুবিনয় বনমালীকেই ধমকায়।

বনমালী বলে—বৌমাকে চিঠি দাও আসতে। ঘর-সংসার থেকে লক্ষ্মীকে তাড়ালে. এখন এসব তো হবেই!

—আমি তাড়িয়েছি? সুবিনয় বলে

শুভা বলে—মা কবে আসবে বাপি?

সুবিনয় কি ভাবছে। মনে হয় তারই দোষ। ইরাকে সে যাবার সময় কেন বাধা দেয়নি। বিমুরও চোখ ছলছল হয়ে ওঠে।

সুবিনয় বলে ওকে কাছে টেনে নিয়ে—মাকে চিঠি দিচ্ছি। এইবার ফিরে আসবে।

এমনি দিনে চিঠি আসে বোম্বাই থেকে। ইরা ফিরছে কালই। শুভা বলে—এয়ারপোর্টে যাবো বাপি! বিমু বলে—আমিও!

মীরা দমদম এয়ারপোর্টে নেমেছে। কি অজানা ভয়ে বুক কাঁপছে তার। লাউঞ্জে ঢুকছে—হঠাৎ দৌড়ে আসে শুভা, বিমু।

—মা, মামণি! তুমি এসেছো মা—

ওরা দুজনে মীরাকে জড়িয়ে ধরে ছোট হাত দিয়ে।

—মা! ওই ডাক, ছোট্ট হাতের কবোষ্ণ স্পর্শ মীরার শূন্য মনে কি নতুন, বিচিত্র সাড়া আনে। মীরাও জড়িয়ে ধরে ওদের দুজনকে। ওই স্পর্শ মীরার মনে কি নির্ভরতা আনে, মনে হয় মীরার প্রথম পরীক্ষাতেই পাশ করেছে সে। আবেগের বশে শুভা বিমু ওকেই মা বলে জড়িয়ে ধরে। আজ এতদিন পর তারা মাকে ফিরে পেয়েছে।

মীরা জানে এই পরীক্ষাই তার শেষ পরীক্ষা নয়। আরও বড় বাধা আছে।

চোখ তুলে দেখে সামনে দাঁড়িয়ে সুবিনয়। মীরার বুক কেঁপে ওঠে। ওই স্থির নিবিষ্ট চাহনিতে দেখেছে মীরা—সন্দেহ নয়, নতুন এক স্বীকৃতি, আবেদন, কৃতজ্ঞতাই ফুটে ওঠে।

সুবিনয় বলে—ফিরে এসেছো—ওরা আবার মাকে ফিরে পেয়েছে। বাড়ি চলো!

মীরা সুবিনয়ের চোখে নিজের কুমারী মনের সুন্দর বিস্মৃত সেই চিরন্তন আবেগময় অতৃপ্ত অনুভূতিকে খুঁজে পায়। বেশ বুঝেছে মীরা—ইরা আর সুবিনয়ের মাঝে একটা নীরব দূরত্বই গড়ে উঠেছিল। আর সেটাকে সাবধানে মেনে চলবে মীরাও।

বলে চলেছে শুভা—জানো মা, বনমালীদা তোমার ওপর খুব রেগে আছে।

—তাই নাকি? চল দেখিগে তাকে। মীরা বলে।

সুবিনয়কে শুধোয় মীরা—কলেজ চলছে কেমন?

মীরা আসার আগে ইরার কাছে ঊর্মিলার ব্যাপার, তাই নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ হবার ব্যাপারে বাধার কথাও শুনেছে ইরার কাছে।

সুবিনয় বলে চলেছে!—মিঃ সোম-এর দল ঊর্মিলা চলে যেতে মিথ্যা বদনাম দেবার আর কিছু পায়নি। তবে তারা চেষ্টা করছে আগামী কমিটি মিটিং-এ বাধা দিতে যাতে প্রমোশন না পাই।

—তাই নাকি!

মীরা কি ভাবছে।

গাড়িটা ওদের বাড়ি পৌঁছেছে।

মীরা এই শান্ত জীবনে এসে কয়েকদিনের মধ্যে নিজেকে সহজভাবে মিশিয়ে দিয়েছে।

তার মনের অতলে যে একটা চিরন্তন নারীমন এত ঝড়ঝাপটার মধ্যেও বেঁচে ছিল এই স্বপ্নসাধ নিয়ে, তা বুঝতে পারেনি সে। বোম্বাই-এর হৃদয়হীন জীবন থেকে তাই এই সংসারে এসে মনে হয়েছিল মীরার যেন মরুভূমির রুক্ষতা পার হয়ে কোন সুধা শ্যামলিমার জগতে এসেছে সে।

অফিসের তাড়া নেই। রাত জেগে পার্টির সেই একঘেয়েমির ক্লান্তি নেই। শান্ত জীবন।

সকালে উঠে মীরা নিজেই সব ব্রেকফাস্ট-এর ব্যবস্থা করে। ততক্ষণে বনমালী বাজার সেরে আসে।

বনমালীও খুশি হয়েছে। বলে সে—সংসারের মায়া বড় মায়া গো! দ্যাখো না—পরের সংসারে আমি কেমন মায়ায় জড়িয়ে গেছি। এই চক্র থেকে বেরুবার উপায় নাই গো।

—ডালে জল দাও—গেল পুড়ে।

মীরা মাঝে মাঝে বেসামাল হয়ে ওঠে। তবু রক্ষে বনমালীই সামাল দেয়।

চা হয়ে গেছে, মীরা চা টোস্ট নিয়ে যায় সুবিনয়ের ঘরে। সে তখন পড়ায় ব্যস্ত।

কোথায় একটা লেখা দিতে হবে।

মীরা চা টোস্ট দিয়ে বলে—ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। খেয়ে নাও, কি এত ভাবছো ?

—কই না তো !

মীরা শুধোয়—তোমাদের কলেজের কমিটি মিটিং কবে বলছিলে ?

সুবিনয় বলে ওসব নিয়ে আর ভাবি না। যা খুশি করুক ওরা, তেমন দেখলে চলে যাবো এখান থেকে অন্য কলেজে।

মীরা দেখছে সুবিনয়ের চোখে যেন বেদনার আভাস, মিথ্যা বদনামে ওর মন ভেঙ্গে গিয়েছে।

—মা। স্কুলের জামা প্যান্ট।

বিমুর ডাকে মীরা বলে—যাই।

মীরা এই শিশুদের কলরবে, তাদের ছোট্ট দুই হাতের বাঁধনে যেন বেশী বাঁধা পড়ে গেছে। নিরক্ষর বনমালীর কথা মনে পড়ে। নিজের সংসার নয়, পরের সংসারের বাঁধনেই সে এমনি ভাবে জড়িয়ে যাবে ভাবেনি।

এ যেন কি এক স্বপ্নের জগতে এসে পৌঁচেছে মীরা।

এই জীবন মীরার কাছে যেন শান্ত স্নিগ্ধ একটি স্বপ্নের মতো। বোম্বাই-এর মেকি মুখোসপরা বিলাসের ধাবমান স্রোত এখানে নেই।

সকালে উঠেই মীরা রান্নাঘরে যায়। চা ব্রেকফাস্ট এখন ঠিকমতো হচ্ছে। মীরা শুভা, বিমুর লাঞ্চ ব্রেকফাস্ট প্যাক করে ওদের খাইয়ে পোশাক পরিয়ে স্কুলে পাঠায়, সুবিনয়ের চা ব্রেকফাস্টও পৌঁছে যায় তার পড়ার ঘরে।

দেখে সুবিনয়, ঘরের সেই বিশ্রী বিশৃঙ্খল ভাবটাও বদলে গেছে। বনমালী বলে —ক'দিন যা চলছিল বাড়িতে ভূতের নেত্য। ঘরের লক্ষ্মী না হলে ঘর মানায় !

সন্ধ্যার পর সেদিন সুবিনয় বাড়ি ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। এতদিন পর স্তব্ধ বাড়িটায় আবার গানের সুর ওঠে। শুভা, বিমু আর মীরা গাইছে। যেন আগেকার সেই শান্তির দিনগুলোই ফিরে এসেছে।

মীরা এই সামান্য পাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে আজ খুশিতে মেতে উঠেছে।

দেখছে সুবিনয় বাইরের ঘর থেকে। খুশিই হয় সে।

বোম্বাইর উদ্দাম জীবনের স্রোতে আজ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে ইরা। তখন ভাবেনি— এখন মনে পড়ে মীরার কথা। এই জীবনের অন্তরালে লোভী সত্তাটাকে দেখে চমকে

উঠেছে ইরা। আজ মিঃ সাহানী কোন বিদেশী অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য বিরাট পার্টির আয়োজন করেছে। এসেছে অনেকেই। মিঃ দাশানী, মিঃ ডিকস্টাও রয়েছে।

মিঃ লাল এদের গ্রুপের অন্য ব্যবসার চিফ। ব্যক্তিগত পরিচয়ও আছে ডিকস্টার সঙ্গে। তাই সেও আমন্ত্রিত।

মিঃ লাল-এর মারফৎ মীরা মডেলিং-এর কিছু কাজ করে।

মীরা চলে যাবার পরে ইরা মীরা সেজেই রয়ে গেছে বোম্বাই-এ। অফিসে যায় গাড়িতে, কাজকর্ম বিশেষ কিছু নেই।

কিন্তু অফিসের ঠাটবাট তার ঘটাও কম নয়। এ যেন এক এলাহি ব্যাপার।

দু' একটা হোটেলও আছে কোম্পানীর।

সেখানে দেশী-বিদেশী অনেক তা-বড় অতিথি আসে। তাদের আপ্যায়ন করা হয় পার্টি দিয়ে।

তার ঘটাও কম নয়।

ক্রমশ ইরাও দেখে ওই মিঃ দাশানী, ডিকস্টাদের। আর ফোনে বিদেশের সঙ্গে কি কথা হয়! তারপরই ওদের কেমন উত্তেজিত দেখায়। রাতেও যেন কিছু লোক কাজ করে।

ডক, এয়ারপোর্টে তাদের ঘনঘন যাতায়াত বাড়ে, তারপরই আবার শুনশান।

নিজের ছন্দে অফিসের কাজ চলে।

টাকার আমদানী হয়, মাল আনা নেওয়া করে।

ইরাও মডেলিং শুরু করেছে।

শুরুটা অবশ্য মীরাই করেছিল। ইরা আজ মীরা সেজে তারই জের টেনে চলেছে মাত্র।

সেই কাজে ইরা প্রথমে একটু অসুবিধায় পড়েছিল। স্টুডিওতে ফ্লাড লাইটের সামনে রকমারী কোম্পানীর বিচিত্র সব পোশাক পরে বিভিন্ন পোজে ঘুরে ফিরে ছবি তোলাতে হয়। কখনও দেহের সৌন্দর্য সুষমাকে প্রকট করে দর্শকদের সামনে তুলে ধরতেও হয়। কেমন বাধ বাধ ঠেকতো ইরার।

মিঃ লাল বলে—কি হল তোমার মীরা। এতদিন মডেলিং করে শেষে মেডেলিং মুডই অফ্ হয়ে গেল।

ইরা সচকিত হয়ে ওঠে। যেন ধরা পড়ে গেছে সে, সেই ঘটনাটা ঘটতে দিতে সে রাজী নয়।

এত সহজে হার মানবে না ইরা। তাই আবার সহজ হয়ে ওঠে ইরা।—না, না মিঃ লাল। এবার ঠিকই হবে।

নিজেকে মীরার মত করেই তুলে ধরে ইরা। মিঃ লালও খুশী হয়—বাঃ, পারফেক্ট মীরা!

ইরা ক্রমশ মিঃ লালকেই যেন বেশী করে চেনে, লোকটাকে বন্ধু বলেই মেনে নেয়।

অফিসের কাজের মধ্যেই দেখেছে ইরা মিঃ দাশানী, মিঃ ডিকস্টাদের। ওরা দেখেছে ইরার যৌবনময় দেহটাকেই, ইরার রূপ যৌবন হারায়নি। মিঃ দাশানী সেদিন বলে—ইউ লুক চার্মিং মীরা!

ইরা সরে আসে। কেমন বিশ্রী লাগে লোকটাকে। ওর আঙ্গুলগুলো যেন নির্লজ্জের মতো ইরার কাঁধে চেপে বসেছিল। আরও কি যেন চাইছিল লোভী মানুষটা। দেখেছে ইরা ওই জানোয়ারের মতো বলিষ্ঠ মিঃ ডিকস্টাকে। মুখে মদের গন্ধ!

—হাই মীরা!

ইরা চমকে ওঠে। অফিসের লাঞ্চ টেবিলে কোনোরকমে খাওয়া সেরে উঠে পড়ে সে।

এদের তুলনায় মিঃ লাল যেন অনেক ভদ্র। মাদ্রাজ থেকে বেশ কিছুদিন পর ফিরেছে মিঃ লাল। ওর জন্য এনেছে একটা দামী কাঞ্চীভরম শাড়ি। ফ্ল্যাটে এসেছে, শুধোয় মিঃ লাল—মীরা, তোমার বোনকে দেখছি না?

মিঃ লাল মীরার কাছে জেনেছিল তার বোন ইরা বোম্বাইতে এসেছে।

ইরাই আজ মীরা সেজে রয়েছে এখানে।

ইরা বলে মিঃ লালকে—ওর তো ঘর-সংসার, স্বামী রয়েছে। ফিরে গেছে বাড়িতে।

মিঃ লাল বলে—এ গুড লেডি। ওদিকে গেলে ডঃ ঘোষ-আই মিন তোমার ব্রাদার-ইন-ল'র বাড়িতে যাবো।

ইরা বলে—বেশ তো!

শাড়িটা দেখে ইরা বলে—এ কি এনেছো লাল!

—কেন তোমার পছন্দ নয়? আফটার অল বেঙ্গলী গার্লস-এর শাড়িই বেশী পছন্দ! তাই আনলাম তোমার জন্য মীরা!

ইরা বলে—দারুণ শাড়ি। এইটা পরেই আজ পার্টিতে যাবো। বাই দি বাই, লাল, ওই মিঃ দাশানী, মিঃ সাহানীদের তো দেখি প্রায়ই পার্টি—এত খরচা হয়!

মিঃ লাল বলে—এটা ব্যবসায়েরই অঙ্গ!

—কিসের ব্যবসা!

মিঃ লাল কি ভাবছে, দেখছে সে ইরাকে।

এর মধ্যে ইরা শাড়ি বদলেছে, গলায় দিয়েছে সেবারের উপহার পাওয়া নেকলেশটাকে। এত দিনে চিনেছে ইরা, মিঃ দাশানীই ওই নেকলেস দিয়ে এসেছিল। কি কাজের জন্য তা জানে না।

পার্টিতে তখন অতিথিদের তুরীয় অবস্থা। বিরাট হলঘরের আলোগুলো মৃদু করা, আলো-আঁধারির পরিবেশ গড়ে উঠেছে। মেয়েরা যেন স্বল্পবাসে তাদের যৌবনকে উদ্দাম নেশার ঘোরে বিলিয়ে দিতে চায়।

—ডারলিং!

মিঃ দাশানীর হাতে মদের গ্লাস, চোখে নেশার ঘোর। ইরাকে এসে জড়িয়ে ধরে ওর গলায়ও মদ ঢেলে দেয়।

জীবনে মদ এর আগে খায়নি ইরা। ঝাঁঝালো ওই তরল পানীয়টা তার গলা দিয়ে জ্বলতে জ্বলতে নামে। সারা দেহে পেঁচিয়ে ধরেছে দাশানীর লোভী হাতটা।

বলে দাশানী—হারটা সুন্দর মানিয়েছে। এবার তোমাকে রিয়েল পার্ল আর ডায়মণ্ড-এর নেকলসই দেব, আরও সামথিং মাই ডিয়ার!

ইরা নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে। খুঁজছে মিঃ লালকে।

এমনি বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়তে হবে ভাবেনি ইরা। এরা তার সর্বকিছু লুঠ করতে চায়।

সামনে মিঃ লালকে দেখে চাইল দাশানী। ইরা এই ফাঁকে সরে যায় ভিড়ের ওদিকে। কি রাগে ফুঁসছে সে!

মিঃ লাল ব্যাপারটা বুঝে বলে—টেক ইট ইজি মীরা! এ তো পার্টিরই অঙ্গ!

ইরা সরে এসেছে হলের এক কোণে।

ইরা বলে—আই হেট অল দিস্। ঘেন্না করি এসব। ন্যাস্টি! জানোয়ারের দল! চলো এখান থেকে। এক্ষুনিই!

হঠাৎ ডিকস্টাকে দেখে চাইল ইরা।

ডিকস্টার সঙ্গে মিঃ সাহানী স্বয়ং। মোটা লোকটার ভাবলেশশহীন মুখে চুরুট।

—হ্যাল্লো মীরা!

দেখছে মিঃ সাহানী ইরাকে।

বলে সাহানী—বাড়ি যেতে চাও? ও-কে। ডিকস্টা, সেন্ড হার হোম। মিঃ লাল একটু পরে যাবে!

ইরা এখান থেকে বের হতেই চায়।

তাই চলে গেল সে। মিঃ লাল একটু অবাক হয়, কিন্তু মিঃ সাহানীর জন্য লাল ইরাকে কিছু বলতে পারে না।

মিঃ লাল জানে এদের আসল ব্যবসাটা কি। মিঃ দাশানী, ডিকস্টাদের লোক-দেখানি দু' একটা কারখানা, কাপড় ডাইং মিল এসব আছে। কিছু তৈরী পোশাকও এক্সপোর্ট করে আরব দুনিয়ায়। সেখানে টাকার অভাব নেই।

তবে ওসব ম্যানুফ্যাক্টারিং এক্সপোর্ট এর কাজটা লোক-দেখানি ব্যাপার।

মিঃ দাশানীর কোম্পানীর আসল ব্যবসাটা সম্পূর্ণ আলাদা। সেটা চলে গোপনে আর তাতেই আসে অঢেল পয়সা।

বিদেশ থেকে সোনা হীরা অনেক বেআইনী মালপত্র আসে। রাতের অন্ধকারে দূরে সমুদ্রে সেসব ডেলিভারি নেওয়া হয়, গোপন গুদামে ওঠে সেই সব মাল, আবার পাচার হয়ে যায় অন্যত্র।

এছাড়া অন্য অনেক কোম্পানী, ব্যক্তি বিশেষ এইসব মাল আনায়। তাদের লোকবল নেই। তাই দাশানী কোম্পানী তাদের হয়ে মাল খালাস করে, পাচার করে। তার

পায় বিরাট অঙ্কের কমিশন। ইদানীং এই সব ব্যবসার সঙ্গে যোগ হয়েছে হেরোইন, ব্রাউন সুগারের আমদানী রপ্তানী।

এক দেশ থেকে আসে এসব মাল, তারপর এই সব জিনিস আবার বিভিন্ন দেশী বিদেশী এজেন্টদের মারফৎ বিদেশে চালান যায়। কিছু ভারতবর্ষের এদিক সেদিকে পাচার হয়। এতেই আসে কোটি কোটি টাকা। লাল হোটেলে আজ বেশ কিছু অচেনা বিদেশী অতিথিদের দেখেই ব্যাপারটা কিছু অনুমান করেছিল।

মিঃ দাশানীরাও এ কাজে পটু, তাদেরও চোখ সর্বত্র।

আজ তারা বেশ কিছু মাল পেয়েছে। আরও খবর পেয়েছে যে হোটেলের বাইরে পুলিশও জাল পেতে রেখেছে। তারাও কি ভাবে আজকের চালানের খবর জেনে গেছে।

কয়েক লক্ষ টাকার মাল তাদের সরাতেই হবে যে ভাবে হোক। ডিকস্টার মাথাতেই বুদ্ধিটা আসে।

ওদের এজেন্টদের পুলিশ অনেককেই চেনে। তাই তাদের দিয়ে একাজ করানো যাবে না। তার জন্য চাই নতুন কোন লোক যে পুলিশের নজরে নেই। তাই ইরা ফ্ল্যাটে যাবার কথা বলতেই ওরাও সেইমত ব্যবস্থা করে। ডিকস্টা জানে একাজে তৃতীয় ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখা নিরাপদ নয়।

তাই মিঃ লালকে সেই বাধা দেয়—তোমার জন্য পাবলিসিটির ব্যাপারে জরুরী আলোচনা আছে লাল।

মিঃ লাল রয়ে গেল। গাড়িটা ইরাকে ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেবার জন্য বের হয়ে গেল। ডিকস্টার একজন লোকও সঙ্গে চলেছে ইরাকে পৌঁছে দিতে।

ইরা বেশ ক্লান্তি বোধ করে। দিন-ভোর অফিস দু'একজন পার্টির এখানে ওখানে ঘুরেছে। তারপর হোটেলের পার্টিতে এসেছে। এখানে এসে আরও বিশ্রী লাগে তার। ওই মানুষগুলো এতদিন তার সামনে যেন মুখোশ পরে ছিল, ওদের চিনতে পারে নি।

ক্রমশ ওদের প্রকৃত স্বরূপটাকে সে চিনছে।

ক্লান্তি বোধ করে ইরা।

গাড়িটা চলেছে।

হঠাৎ খেয়াল হয় ইরার, হোটেল থেকে তার ফ্ল্যাট আধঘণ্টার পথ। কিন্তু সে পথে গাড়ি চলেনি—এ যেন অন্য পথ দিয়ে চলেছে গাড়িটা।

কোথায় চলেছি ? ইরা শুধোয় সামনের সিটে বসা লোকটিকে।

সে কোন জবাবই দেয় না, এদিক ওদিকে দেখছে।

ইরা উত্তেজিত ভীত কণ্ঠে বলে—গাড়ি ঘোরাও।

হঠাৎ পিছনে একটা তীক্ষ্ণ সাইরেনের শব্দ শোনা যায়।

ইরাও অবাক। পুলিশের জিপ এগিয়ে আসছে। নিমেষের মধ্যে এরাও গাড়ির গতিবেগ দ্বিগুণ করে তোলে আর সেই লোকটার হাতে বের হয়ে এসেছে একটা ছোট

সাইজের বন্দুকই।

পুলিশ গাড়িটাকে বোধহয় চিনেছে। তাই এগিয়ে আসছে এধারে আটকাবার জন্য। ইরা ভীত ত্রস্ত। গাড়ি চলেছে হাওয়ার বেগে।

যে কোন মুহূর্তে কোন কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগলে চুরমার হয়ে যাবে।

—গাড়ি থামাও। ইরা চীৎকার করে।

পিছনে পুলিশের গাড়িটা এগিয়ে আসছে। লোকটা গর্জে ওঠে—চুপ করে বসে থাকো।

স্থির লক্ষ্যে সে পিছনের গাড়ির টায়ারেই গুলি করেছে।

পরপর কয়েকটা গুলি। পিছনের জিপ থেকে গুলিতেই তার জবাব আসে।

ইরা ভীত। নিবিড় উত্তেজনায় ঘামছে। গুলির শব্দ ওঠে। দেখা যায় পিছনের গাড়িটার টায়ার বসে গেছে বোধহয় এদের গুলিতে। আর এগোতে পারে না। এরা বের হয়ে যায়।

ইরা হঠাৎ ভয়ে নীরব হয়ে গেছে। আজ বুঝেছে এরা সাংঘাতিক কিছু কাজই করে থাকে। গাড়িটা পাহাড়বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে টালমাটাল খেতে খেতে। দূরে পাহাড়ের গায়ে সমুদ্রের খাঁড়ির উপর একটা ভাঙ্গা কেল্লার মধ্যে ঢুকতে, কারা বের হয়ে এসে গাড়ি থেকে বেশ কয়েকটা স্যুটকেস বের করে চলে গেল ওই অন্ধকার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে।

অন্য একটা গাড়িতে ইরাকে তুলে দিয়ে বলে ডিকস্টা—গুড জব মীরা! নাউ গো লাকি গার্ল।

অন্য গাড়িতে ফিরছে ইরা। অজানা ভয়ে তার মুখ চোখ বসে গেছে। বেশ বুঝেছে ইরা, সে এক বিরাট অন্ধকারের হিংস্র চক্রের সঙ্গে তার অজান্তেই জড়িয়ে গেছে।

রাতভোর ঘুমুতে পারে না ইরা, সেই বন্দুকের শব্দ, গাড়ির গতিবেগ, ওদের হিংস্র চাহনি মনে পড়ে।

মিঃ লাল হোটেল থেকে বের হয়েছে তখন গভীর রাত্রি। ওর ফ্ল্যাটে ফিরছে।

কিন্তু তখন ও ভাবছে মীরার কথা। মিঃ দাশানীরা এমনিই। ওরা নিজেদের প্রয়োজনে এমনি অনেক নিরীহ মানুষকে জড়িয়ে ফেলেছে তাদের দলে।

তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে না হয় তাদের অজ্ঞাতসারেই এই সব কাজে নামায়। আর এ পথে যে একবার পা দেয় তারপর আর তার ফেরার কোন পথই থাকে না। এ পথ চরম বিপদের পথ।

তাই মীরার জন্য তার ভাবনা হয়। ক'বছরে লালও ওই মেয়েটার কাছে এগিয়ে এসেছে। ভদ্র শিক্ষিতা ওই মেয়েটি এগিয়ে এসেছে তার দিকে।

এবার মিঃ লাল নিজেরই পার্বালিসিটি ফার্ম শুরু করেছে। কাজকর্মও ভালোই পাচ্ছে। মীরাকে ও এবার বলবে ওদের ফার্ম ছেড়ে তার ফার্মে চলে আসুক।

অন্তত ভদ্রভাবে, শান্তিতে কাজ করতে পারবে। চাই কি এবার দুজনে ঘরও বাঁধবে। ওদের জগৎ থেকে সরিয়ে আনবে মীরাকে।

ইরার ঘুম আসে না। আজকের রাত্রির ঘটনাটা তার মনে ঝড় তুলেছে। দেখেছে ইরা গুজরাট হাইওয়ের বাঁদিকে সেই পাহাড়বনের ডেরাটা।

নীচে সমুদ্রের খাঁড়ি। সোজা নেমে গেছে পাহাড়টা। সেই বনের মধ্যে বোধ হয় পর্তুগীজ আমলের একটা পাথরের কেল্লাই তাদের আস্তানা।

নীচে সমুদ্রের খাঁড়িতে কয়েকটা লঞ্চ, স্পিডবোটকে ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিল।

ওদের সেই সুটকেসে কি দামী মালপত্র ছিল জানে না, দেখেছে ইরা। ছায়ামূর্তির দল তক্ষুনি সেইসব মাল নিয়ে অন্ধকারে নেমে গেল। বোধহয় লঞ্চে করে কোথাও পাচারও করেছে। ওদের কাজের নমুনা দেখে এবার ঘাবড়ে গেছে ইরা। দেখেছে কত সহজে এরা গুলি চালাতে পারে নিপুণভাবে।

পুলিশকে আজ থামিয়েছে, কিন্তু পুলিশ একবার যখন এদের পিছু নিয়েছে, সহজে ছাড়বে না।

আজ যদি ধরা পড়তো তারা—এতক্ষণ ফ্ল্যাটে নয়, ইরাকে ওরা নিয়ে যেত থানায়!

কালকের কাগজেও খবরটা বের হতো, হয়তো ছবিও ছাপা হতো কুখ্যাত কোন মেয়ে স্মাগলারের পরিচয়ে।

ইরা তাই এবার সরে আসতে চায়। বিদেশ বিভুঁই জায়গা। একা পড়ে আছে সে। তাই মনে পড়ে মিঃ লালের কথা। এ নিয়ে এখুনি কলকাতায় ফোন না করে মিঃ লালের সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় করা যাবে।

বোম্বাই-এ সকাল হয় একটু দেরীতেই। মিঃ লাল শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ফোনটা বাজছে।

মিঃ লাল যেন কি বিচিত্র স্বপ্ন দেখছিল। সে আর মীরা দুজনে গেছে মহাবালেশ্বর পাহাড়ে বেড়াতে। ঢেউ খেলানো পাহাড়, বনে ঢাকা!

সাদা মেঘের দল আকাশে ভেসে চলেছে। সবুজ ঘাস ঢাকা মাঠ, পাইনবনে তারা হারিয়ে গেছে।

…কোথায় একটা শব্দ ভেসে আসে?

…চোখ মেলে মিঃ লাল।

কোথায় মহাবালেশ্বরের সবুজ পাহাড় বন! সে তার বোম্বাই-এর ফ্ল্যাটেই রয়েছে। মীরাও তাই।

কি স্বপ্ন দেখছিল সে। ফোনের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়। মিঃ লাল ফোনটা তোলে।

—মিঃ লাল। ওদিক থেকে গলা শোনা যায় মেয়েলি কণ্ঠস্বর।

—মীরা ! মিঃ লালের মনে পড়ে গত রাতের কথা। ব্যাকুল কণ্ঠে শুধায় সে।

—কি ব্যাপার মীরা ?

মীরারূপী ইরা আজ সত্যি ভয় পেয়েছে। তার কণ্ঠস্বরে ভয়ের ছাপ। বলে সে—একবার আসতে পারো, এই সকালেই ?

মিঃ লাল বলে—তুমি ভালো আছো তো ?

—হ্যাঁ, জরুরী কথা আছে। বলে ইরা।

মিঃ লাল বলে—আসছি মীরা।

মীরা আসলে তখন বাংলামুলুকের ছোট্ট শহরে তার আজকের জগৎ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। চিরকাল এমনিতেই সে বুদ্ধিমতী আর কিছুটা বেপরোয়া সাহসী।

এখানে এসে এই সংসারের সঙ্গে বেমালুম মিশে গেছে মীরা।

শুভা, বিমুও শান্তিতে আছে।

মীরা দেখেছে সুবিনয়কে। একটা মিথ্যা অপবাদ যেন তার মনের সব শান্তিকে বিঘ্নিত করে তুলেছে। তার করার কিছুই নেই।

নিরীহ লোকটা শহরের কিছু লোভী মানুষের চক্রান্তের অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে।

মীরারও যেন জেদ চাপে।

এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়াবেই। আসল সত্যকে সে বের করবেই। বের করবে এসবের মূলে কারা, প্রমাণও বের করবে সে।

মীরা তাই শহরের দু'তিনটে ছাপাখানার লোকদের দু'একজনকে হাতে এনেছে। তাদের টাকা বেশ কিছু দিতেই একজন এগিয়ে আসে। সে ফকির দাস।

একটা প্রেসের কম্পোজিটার। গাঁজার নেশাও আছে। সে-ই একসঙ্গে দুটো নম্বরী নোট হাতে পেয়ে আরও কিছু টাকা নগদ পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে তাদের ছাপাখানার পুরনো ফাইল ঘেঁটে সেই হাতে লেখা ইস্তাহারের মূল খসড়াটাই এনে দেয় মায়, বিল রসিদ অবধি।

সেখানে শশীবাবুর নামেই বিল করে ওই লিফলেটের কাগজ ও ছাপার টাকা নেওয়া হয়েছে। পোস্টারের খসড়ার মূল কপি, বিলও পেয়ে যায় মীরা।

এসব খবর সে গোপনেই রাখে।

ঊর্মিলাকেও খুঁজেছে মীরা। তার কাছেও ব্যাপারটা জানা দরকার। কিন্তু সে এখন জেলা শহরে রয়েছে। মেয়েদের কলেজে। মীরা ভাবছে সেখানে যাবার কথা। কিন্তু এখনই যাবার সময় তার নেই।

শুভা, বিমুর এ্যানুয়াল পরীক্ষা চলছে। শুভা বলে, মা মণি, তুমি এখন কোথাও যাবে না।

বিমু বলে দুহাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে।—তুমি গেলে নির্ঘাৎ পরীক্ষা খারাপ হয়ে যাবে। তুমি যেও না এখন!

বনমালীও বলে—ওরা তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবেনি দিদি। ক'দিন বোম্বাই-এ ছিলে নাওয়া খাওয়া ভুলে গেছল। পড়াশোনাও। তুমি এসেছো ব্যাস! আবার ওরা খুশি। পরীক্ষার সময় কাছে না থাকলে চলে?

—ঠিক আছে, থাকছি বাবা!

মীরা তার যাওয়া বন্ধ করে।

সুবিনয়ও খুশি হয়। সেই ঘটনার পর থেকে ইরা সুবিনয়-এর শয্যা আলাদা। ইরা যেন মীরাকে একটা চরম বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে গেছে।

মীরা অন্য ঘরেই শোয়। ইরার সেই রীতিটার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সুবিনয়ও ভদ্র, মার্জিত রুচির মানুষ! তাই ইরার এই ব্যবস্থাটাকে সেও মেনে চলেছে। তবু মীরার এ বাড়িতে আসার পর থেকে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সুবিনয়ও খুশিই হয়েছে।

আরও খুশি হয়েছে মীরার অকুণ্ঠ সেবায়। এ যেন অন্য ইরা। কোন অভিযোগ নেই। সহজভাবেই সবকিছুকে মেনে নিয়েছে।

সুবিনয় সেদিন কার্ডটা দেখিয়ে বলে—ইরা। ঊর্মিলার বিয়ে! ইর্নাজনিয়ার দত্তও বারবার করে ওদের বিয়েতে যেতে বলেছে।

—তাই নাকি! মীরাও খুশি হয়। বলে সে—আমার এখন যাওয়া হবে না। শুভা, বিমুর পরীক্ষা চলছে। তুমি একবার ঘুরে এসো।

—আমি! একটু অবাক হয় সুবিনয়, বলে সে—আমি গেলে শহরের এরা কত কিছু ভাববে! একে তো এখন প্রফেসার সোম দল তৈরী করেছে। সামনের বোর্ড মিটিং-এ কমিটিকে চরম সিদ্ধান্তই নিতে হবে আমার বিরুদ্ধে, আবার যাবো ওখানে?

মীরা বলে—নিশ্চয়ই যাবে, বিয়েতে না গেলেই খারাপ দেখাবে। কোন সত্যই যেখানে নেই, সেখানে ভয় করবে কেন? বরং গিয়ে ওদেরও দুজনকে এবাড়িতে আসতে বলে এসো।

অবাক হয় সুবিনয়। খুশিও হয়, অন্তত ইরা তাকে শেষ পর্যন্ত ভুল বোঝেনি।

প্রফেসর সোম, প্রফেসর দাস, তাদের দলের অন্যরা এখন একটু আরামেই আছে। কারণ সুবিনয়ও ভেবেছে তার বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ খণ্ডণের কোন প্রমাণই তার হাতে নেই। তাই এবার মিটিং-এ প্রফেসার সোমকেই প্রিন্সিপ্যাল করা হবে। তার এই কলেজে থাকা আর বোধহয় যাবে না।

তাই সুবিনয় ওদের আসা-যাওয়া ক্লাশ নেওয়া-নানেওয়ার ব্যাপারে নীরবই রয়ে গেছে।

ফলে তাদের স্বাধীনতা এখন অবাধ। আর সেই স্বাধীনতাকে চিরস্থায়ী করার জন্যই প্রফেসর সোম এখন শহরের আরও দু'একজন কমিটি-মেম্বারকে হাতে এনেছে।

এখন সে নিজেই প্রিন্সিপ্যাল হবার স্বপ্ন দেখে। কন্ট্রাকটার বন্ধু শশীবাবুও বলে—তাহলে কাম ফতে হলে বিলডিং-এর ঠিকাটাও পাইয়ে দিও হে। তোমার পথ তো সাফ করে দিইছি।

প্রফেসর সোম বলে—এদিক সাফ। কিন্তু ভয় হয় ওই প্রেসিডেন্ট শীতলবাবু আর সেক্রেটারী নিবারণ ডাক্তারকে। দুজনেই সেই এক গোঁ ধরে বসে আছে।

শশীবাবু বলে--কমিটির অন্য মেম্বাররা যদি মেনে নেয় ওদেরও মানতে হবে। ভোটাভুটিতে ভোট আমরাই পাবো। ক' শালাকে তো হাতে এনেছি।

শীতলবাবু ভেবেছিলেন এর মধ্যে সুবিনয় নিশ্চয়ই কোন প্রমাণ হাতে আনবে। নিবারণবাবুও চান সুবিনয়বাবুই প্রিন্সিপ্যাল হোন, কিন্তু প্রতিপক্ষও কঠিন।

তাই ভয় হয় তাদের।

শীতলবাবু বলেন—ডাক্তার, ওই বাজে লোকটা যদি প্রিন্সিপ্যাল হয়, আমি কমিটিতে থাকছি না। ইস্তফাই দেব। আমি ব্যবসাদার—ইঁট, সিমেন্ট, লোহা, চালানের ব্যবসা করি। এরা যে আমার থেকেও বড় ব্যবসাদার হে! শিক্ষার মত পবিত্র জিনিসকে নিয়ে দুনম্বরী ব্যবসা শুরু করেছে। এদের ধারে কাছে থাকলে বিপদ হে।

নিবারণ ডাক্তারও সেই কথাই ভাবছে। জানে সে, কলেজকে কেন্দ্র করেই এবার ব্যবসা গড়ে উঠবে। নিবারণ ডাক্তার বলে—আমাকেও তাই করতে হবে শীতল। তুমি থাকবে না, আমিও নেই। এই কমিটি মিটিং-এর পরই সরে আসবো। ডাক্তারী করছি তাই করবো। ওসব নোংরামিতে আর যাবো না।

তাই ওরা সেই মিটিং-এর দিন গুণছে।

শুভা, বিমুর পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়েছে। এবার দুজনেই ভালো রেজাল্ট করেছে।

সুবিনয় যেন এর জন্য ইরার কাছে কৃতজ্ঞ। বলে সে—এসব তোমার জন্য হয়েছে ইরা!

মীরা হাসে।

বনমালীও খুশি। বলে সে—হবে না! বৌদি তোর সংসারের লক্ষ্মীরে। তাকে তুই আজও চিনলি না।

ঊর্মিলা এখন শহরে নতুন সংসার পেতেছে সুব্রতকে নিয়ে। সুব্রতও তার অফিসের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, ঊর্মিলাও শহরের গার্লস কলেজে অধ্যাপনা করে।

সেদিন সকালে হঠাৎ রিক্সাটাকে তাদের বাড়ির বাইরে এসে থামতে দেখে ঊর্মিলা অবাক হয়। নামছে ইরা বৌদি। ছুটে যায় ঊর্মিলা। সে ভাবতেই পারেনি যে ইরা বৌদি আসবে তাদের বাড়িতে।

—আসুন বৌদি!

মীরা দেখছে ঊর্মিকে। ঊর্মিলাও তাকে ইরা বলেই জেনেছে।

মীরা বলে—তোমাদের বিয়েতে আসতে পারিনি, ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা চলছিল। ভাবলাম যাই একবার দেখা করে আসি।

সুব্রতও এগিয়ে আসে। নমস্কার বৌদি।

মীরাও ঊর্মিলাকে পেয়ে খুশি। আজ মীরার ওকে দরকার, সামনের লড়াই তাদের জিততেই হবে। আর তার জন্য আটঘাট বেঁধেই তৈরী হচ্ছে মীরা।

সুব্রতও বলে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে যে ভাবে হোক। ওই শশীবাবুর সব কাজ ক্যানসেল করেছি। এরপরও ওইসব করেছে সে।

ঊর্মিলা বলে—তাই ভালো। আমরাও যাবো ওইদিন।

মীরা বলে—তাই চলো। একদিন ঘুরে আসবে—আর এই ব্যাপারেও একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ঊর্মিলা বলে—তাই যেতেই হবে ওখানে ওই মিটিং এর দিন।

শহরে বেশ সাড়াই পড়েছে ওই মিটিংকে কেন্দ্র করে, সুবিনয়-এর-মন মেজাজও ভালো নেই।

সকালে মীরা বলে—এত মন খারাপ করছো কেন?

সুবিনয় বলে—না, ইরা। যা হবার হোক। আমি সহজেই সব মেনে নোব। দরকার হলে এখান থেকে চলেই যাবো আমরা।

সুবিনয় কলেজে বের হয়ে যায়।

মীরা অপেক্ষা করছে ঊর্মিদের জন্য।

কলেজে বেশ সাড়া পড়ে গেছে। প্রফেসর সোম, প্রফেসর দাস আরও অনেকে সকাল থেকেই ব্যস্ত। তারাও কয়েকজন কমিটি মেম্বারকে হাতে এনেছে।

আজ প্রফেসর সোম বেশ জ্বালাময়ী ভাষায় লেকচারটা লিখে রিহার্সেল দিয়ে এসেছে।

মিটিং-এর ফ্লোরে সেই-ই এবার প্রশ্নটা তুলে জ্বালাময়ী ওজস্বিনী ভাষায় লেকচার দিয়ে চলেছে। আদর্শ শিক্ষাব্রতীর কি কি গুণ থাকা দরকার তারই ফিরিস্তি দিয়ে, এবার ওই প্রফেসর সুবিনয় বাবুর যে সে সব কোন গুণ নেই, বরং যা আছে তা বদগুণ তাই জানাতে চায়।

চরিত্রহীন, আদর্শভ্রষ্ট শিক্ষককে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাখা যে সসর্প গৃহে বাস করার মতই সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক সেই কথাটাই দৃপ্ত স্বরে ঘোষণা করে।

প্রফেসর সুবিনয় ঘোষ চরিত্রহীন তা প্রমাণিত। জনমত তাকে স্বীকার করে না।

জনসাধারণের কাছে সে দোষী।

প্রফেসর সোমের বক্তৃতার পর শহরের আর একজন নাগরিকও জানায় প্রফেসর ঠিকই বলেছেন। তিনি গার্জেনদের প্রতিনিধি হিসাবে কমিটিকে অনুরোধ করেছেন এই চরম অপদার্থ চরিত্রহীন শিক্ষককে যেন পত্রপাঠ বিদায় করা হয়, তাকে প্রমোশন দেওয়াতো দূরের কথা। না হলে কলেজে তিনি ছাত্র ছাত্রীদের এর প্রতিবাদে ধর্মঘট করতে বলবেন। শুরু করবেন লাগাতার ধর্মঘট অনশন ইত্যাদি প্রভৃতি। টেবিল চাপড়ে ওর এই বক্তব্যকে সমর্থন করে প্রফেসর সোমের দল।

সুবিনয় ওদিকে চুপ করে বসে আছে। সে আজ নিঃসঙ্গ একা। তার সমর্থনে একটি কথা বলারও কেউ নেই।

শীতলবাবু ব্যস্ত মানুষ, কিন্তু তিনি, মায় নিবারণবাবুও আজ অসহায় বোধ করেন ওদের দলবদ্ধ আক্রমণের বিরুদ্ধে। কোন বক্তা তখন প্রফেসর সোম-এর স্বপক্ষে ওকালতি শুরু করেছে। জানায় সে, প্রিন্সিপ্যাল হবার যোগ্য ব্যক্তি এই প্রফেসর সোমই। সুবিনয়বাবু নন, তার এগেনস্টে চার্জসিটই সঙ্গত হবে এই চরিত্রহীনতার জন্য। অন্যতম পৃষ্ঠপোষক শশীবাবু বলেন সভাপতি সেক্রেটারীকে—আপনারা নিরপেক্ষ বিচার করবেন এই আশাই করবো।

সুবিনয় জানে বিচার কি হবে।

হলে বেশ উত্তেজনা চলেছে। এমন সময় ইরা রুপী মীরাকে ঢুকতে দেখে সবাই অবাক হয়।

—আসতে পারি?

শীতলবাবু, নিবারণবাবুও ইরাকে চেনেন। তাই বলেন—আসুন।

প্রফেসর সোম বলে ওঠে—কমিটি মিটিং এ উনি কেন আসবেন?

সকলেই একটু অবাক হয়। সোমের দলের দু' একজনও বলে—উনি কেন আসবেন?

সুবিনয় অবাক হয় ইরাকে এই এই অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্যে জড়াতে দেখে। কিন্তু ইরা রুপী মীরা আজ স্পষ্ট সতেজ স্বরে বলে—আপনারা আমার স্বামীর বিরুদ্ধে প্রধানত চরিত্রহীনতার অভিযোগ এনেছেন।

প্রফেসর দাস বলে—হ্যাঁ! উনি চরিত্রহীন।

মীরা জানায়—তাই স্ত্রী হয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে আনা এতবড় অপমানজনক অপবাদের বিরুদ্ধে আমি কিছু জানাতে চাই।

প্রফেসর সোম বলে—কি জানাবেন আপনি?

শশীবাবু বলে ওঠে—সবাই জানে ওঁর গুণের কথা!

মীরা বলে—কিন্তু সবাই, শহরের লোকজন এমনকি কমিটির চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী অন্য মেম্বাররা যারা আজ বিচারকের আসনে বসেছেন তাঁরা জানেন না ওই পোস্টার লিফলেট, যার ভিত্তিতে এই অভিযোগ করা হয়েছে সেটা কারা ছাপিয়েছিল খর্চা দিয়ে এবং তা কেন? তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। এই যে—

মীরা সেই বিল, ভাউচার, লিফলেট, প্যাম্ফলেটের সব হাতের লেখা কপি এগিয়ে দেয় শীতলবাবু নিবারণবাবুর হাতে।

দেখুন কাদের কাজ এটা, এর জন্য প্রেসকে টাকা দিয়েছেন ওই শশীবাবু। এই তার রসিদ বিল। আর এই প্যাম্ফলেট পোস্টারের জন্য হাতে লেখা কপি। এর হাতের লেখাটা বোধহয় প্রফেসার সোমের লেখাই।

সারা হলে যেন বোমাই ফেটেছে।

শীতলবাবু বিলপত্র দেখে অবাক হন—একি করেছেন শশীবাবু, আপনিই টাকা দিয়ে এসব করিয়েছেন! আর প্রফেসর সোম, এটা তো আপনারই হাতের লেখা! দ্যাখো নিবারণ, কাণ্ডটা দ্যাখো।

সেক্রেটারী নিবারণবাবুও দেখছেন কাগজগুলো।

ইরারূপী মীরা বলে—শশীবাবুকে আমার স্বামী বিলডিং-এর কনট্রাকটা দিতে চাননি—তিনি অসাধু, ব্ল্যাক লিস্টেড—

—না। মিথ্যা কথা। শশীবাবু গর্জে ওঠে।

ঢুকছে সুব্রত, সঙ্গে ঊর্মিলা। সুব্রত বলে—উনি ঠিকই বলেছেন। আমি চিফ ইনজিনিয়ার সুব্রত দত্ত। আমার অফিসই খারাপ কাজের জন্য ওঁর ফার্মকে ব্ল্যাক লিস্টেড করেছে।

ঊর্মি বলে—আর প্রফেসর সোম ওই সময় কলেজের কটা ক্লাশ নিয়েছেন দেখুন। স্টেটমেণ্ট আছে। প্রফেসর সোম প্রফেসর দাশরা কলেজে ক্লাস না নিয়ে কোচিং ক্লাস করতেন। সুবিনয় বাবু প্রতিবাদ করার জন্য ওরা তাঁর চরিত্র হনন করার পথই নিয়ে ছিলেন, আমাকেও অপমান করেছেন মিথ্যা অপবাদ দিয়ে, তাই তাদের শাস্তির জন্য আমিও দাবী জানাতে এসেছি।

মিঃ দত্ত বলে—এই জঘন্য কাজ যে ওরাই করেছেন তার সাক্ষ্য প্রমাণ আপনাদের কাছে দেওয়া হয়েছে। আশা করবো এবার সুবিচারই হবে।

সুবিনয় বিস্মিত চাহনি মেলে দেখছে ইরাকে। সে পারেনি, নীরবে এতবড় মিথ্যা অপবাদ সয়েছে। কিন্তু ইরা আজ যোগ্য স্ত্রীর কাজই করেছে। এতদিনের চেষ্টায় সে কঠিন একটা অন্ধকার থেকে আলোয় প্রকাশিত করে তার হারানো সম্মানকে ফিরিয়ে দিয়েছে। চরম বিপদের দিনে তার পাশে দাঁড়িয়েছে।

সারা হলে স্তব্ধতা নামে।

সব উত্তেজনা টেবিল চাপড়ানি, চীৎকার স্তব্ধ হয়ে গেছে।

প্রফেসর সোম চাইছে শশীবাবুর দিকে। প্রকাশ্য সভায় এই ভাবে তাদের সব গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাবে তা ভাবতেও পারেনি।

এবার শীতলবাবু, নিবারণবাবুদের চেহারাই বদলে গেছে। শীতলবাবু রাগলে একেবারে দেশজ ভাষা প্রয়োগ করেন। বলেন তিনি—কি হইল! চুপ মাইরা গ্যালেন দেহি। কইনি নিবারণ, আমি চাল-লোহা-লক্কড়-সিমেন্টের ব্যবসা করি। এরা বিদ্যা লইয়া ব্যবসা করেন আর নীতি, আদর্শ এইসব লম্বা লম্বা বাত ঝাড়েন। হালার

শশী কনট্রাক্টর যে সিমেন্ট কেনে না তা আমি জানি। গঙ্গামাটি দেই বিলডিং করে। ছাত্রাবাস তো পইড়া না যায়! প্রফেসর সোম ওরেই রেকমেন্ড করেছে সেবারও। এবারও করতি চান ক্যান তাও বুঝি। তাই কমিটিকে জানাইতে চাই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইব সুবিনয়বাবুই! আর প্রফেসর সোম, প্রফেসর দাস, আপনাগোর হাজিরা খাতা দেইখা কমিটি সিদ্ধান্ত লইত্যাছে আপনারা কোচিং ক্লাসই চালান গিয়া! আমাগোর কলেজে আপনাগোর মত করিতকর্মা অধ্যাপকের দরকার নই।

একটা গুঞ্জরণ ওঠে। গলা তুলে বলে—কারো কতাই শুনুম না। আমি প্রেসিডেন্ট, আর সেক্রেটারী নিবারণবাবু এই সিদ্ধান্ত লইত্যাছি। প্রফেসর সোম আপনারা আমাগোর নামে যাইয়া কোর্টে কেস করতি চান করেন। কোর্ট ঘরেরে শীতল পাল ডরায় না! দুষ্টুগরুর চাইতি শূন্য গোয়ালই ভালো, যান আপনারা!

সারা হলে স্তব্ধতা নামে। এবার বেশকিছু লোক করতালি দিয়ে ওঠে। তারা এগিয়ে আসে সুবিনয়কে অভিনন্দন জানাতে।

সুবিনয়ও খুশি! আজ যা সত্য তাই প্রকাশ পেয়েছে। সুবিনয় যেন মুক্তির অনাবিল আনন্দ অনুভব করে। কাল থেকে সে মাথা উঁচু করে কাজ করতে পারবে কলেজে।

প্রফেসার সোম, প্রফেসার দাস ভাবতেই পারেনি এইভাবে তারা বিপদে পড়বে।

এতক্ষণ যারা তাদের সমর্থন করছিল, এবার ওই সব প্রমাণ দেখে তারাও চমকে উঠেছে। তারা নিজেরাও বিপন্ন বোধ করে। কারণ প্রতিপক্ষও শক্তিমান। তাই শীতলবাবুর ওই ঘোষণার কোন প্রতিবাদ না করে তারা সমর্থনই করে তাঁকে।

সারা হলের মানুষ আজ খুশি হয়েছে।

শশীবাবু, প্রফেসর সোমের দল মাথা নীচু করে বের হয়ে আসে।

প্রফেসার সোমদের পায়ের নীচে থেকে যেন মাটি কেড়ে নিয়েছে এবার শীতলবাবু। কলেজের প্রফেসর ছিল বলেই কলেজের ছাত্ররা যেত তাঁদের কোচিং ক্লাসে। এখন কলেজ থেকে বিতাড়িত তারা। অপমানিত, শয়তান বলে প্রমাণিত। ফলে বিপদ ঘনিয়ে আসবে কোচিং ক্লাসের উপরই, শশীবাবুও বিপন্ন বোধ করে।

সুবিনয় যদি কেস করে তাদের সাজা হয়ে যাবে। আজ ওই সুবিনয়ের জন্যই শশীবাবুর এতবড় কাজ ফসকে গেল, কনট্রাকটারি ব্যবসাই বরবাদ হয়ে গেল।

তাই লোভী লোকটা ওকে ছাড়বে না। দরকার হলে চরম আঘাতই করবে ওদের।

সুবিনয় মিটিং-এর পর কলেজে বেশ কিছুক্ষণ আটকে পড়ে।

সহকর্মী অধ্যাপকদের অনেকেই এই ঘটনাটায় ক্ষুব্ধ হয়েছিল, মুখে কিছু বলতে পারেনি ওই প্রফেসর সোম ও তার দলবলের জন্য।

কারণ শশীবাবুর বাজারে অনেক বদনামই আছে। কিন্তু আজ সুবিনয় প্রমাণিত করেছে যে সে নির্দোষ। ওইসব মিথ্যা কলঙ্ক কারা রটনা করেছিল তাও আজ প্রকাশ

হয়ে যেতে ওরাও খুশি।

তাই সুবিনয়কে আজ তারা সকলেই অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা জানায়।

কলেজ থেকে ওই দুষ্টচক্রকে দূর করেছেন শীতলবাবু, এখন শান্তিতে তারা কাজ করতে পারবে।

তাই কলেজের পরবর্তী কার্যপন্থা নিয়েও জরুরী আলোচনা বসে। এইসব নিয়েই দেরী হয়ে যায় সুবিনয়ের।

ফিরছে সুবিনয় আর মীরা কলেজ থেকে। মীরা আজ সুবিনয়কে তার হারানো সম্মান, পদমর্যাদা সব ফিরিয়ে দিয়েছে। যোগ্য স্ত্রীর কাজই করেছে সে। মীরার মনেও খুশির আমেজ নামে।

সুবিনয়ও আজ অপরিসীম কৃতজ্ঞ ইরারূপী মীরার কাছে। কি বলে ধন্যবাদ জানাবে জানে না।

সুবিনয় বলে—আজ তোমার কাছে কৃতজ্ঞ ইরা। তুমি যে এইভাবে ওদের সব চক্রান্ত ফাঁস করে ওদের মুখোস খুলে দিতে পারবে ভাবিনি। আমাকেই নয়, কলেজ, এই প্রতিষ্ঠানকে তুমি চরম সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচিয়েছ।

রাত হয়ে গেছে। পথটা নির্জন, দুদিকে পুরানো গাছের জটলা। হঠাৎ ওই দিক থেকে একটা ট্রাককে আসতে দেখে চাইল ওরা।

চোখ ধাঁধানো হেডলাইট জেবলে ট্রাকটা সোজা ছুটে আসছে ঝড়ের গতিতে, পথ থেকে পাশে সরার কোন লক্ষণই নেই।

রিক্সাওয়ালার মনে হয়, কোন মাতাল ট্রাক ড্রাইভার দিশেহারা হয়ে ছুটে আসছে। এখুনি তাদের ধাক্কা মেরে উড়িয়ে দেবে। চীৎকার করে ওঠে সুবিনয়—এ্যাই কি হচ্ছে? ধাক্কা মারবে নাকি!

রিক্সাওয়ালা বিপদের গুরুত্ব বুঝে কোনরকমে রিক্সা নিয়ে রাস্তার ওদিকে নামতে চায়।

ট্রাকটা এসে পড়েছে। তবু কোন রকমে নীচে গড়িয়ে নামার আগে ট্রাকটা ঝড়ের মত বের হয়ে যায়, ওর পিছনটা শুধুমাত্র একটু লেগেছে রিক্সায়। তাতেই ছিটকে উল্টে পড়ে সাইকেল রিক্সাটা, ছিটকে পড়ে সুবিনয়, মীরা।

তবু জোর বেঁচে গেছে তারা। নাহলে ট্রাকের ধাক্কায় রিক্সাটা গুঁড়িয়ে যেত, ওরা থেৎলে চেপ্টে শেষ হয়ে যেত।

কোনরকমে প্রাণে বেঁচে গেছে আজ সুবিনয়, মীরা।

কপালটা ছড়ে গেছে, হাত পা-ও। রিক্সাওয়ালা উঠেছে। সেও কমবেশী আহত। ট্রাকটা দাঁড়ায়নি। ওর শিকার ফসকে যেতে সেও পালিয়ে গেছে।

রিক্সাওয়ালা বলে—ট্রাকটার মতলব ভালো ছিল না বাবু, এমনি করে দু-একজন মারা গেছে এখানে, আজও তেমনি কিছু ঘটাতে চেয়েছিল ওই ব্যাটা।

ব্যাপারটা যে তেমনি কিছু, তা বুঝেছে সুবিনয়। তাই তাড়াতাড়ি এই নির্জন পথ থেকে চলে যেতে চায়, বলে সুবিনয়—হাসপাতালে চলো রিক্সা নিয়ে। ওষুধপত্র

ইনজেকশন নেওয়া দরকার !

মীরা প্রতিবাদ করতে চায়। কিন্তু সুবিনয় বলে—কোন রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে না. চলো হাসপাতালে।

এর মধ্যে সময় কিন্তু বসে নেই।

সেদিন বোম্বাই-এর ফ্ল্যাটেও আর এক নাটক ঘটতে চলেছে সবার অলক্ষ্যে।

মিঃ দাশানী, ডিকস্টা সেই রাতে ওই ভাবে মীরারূপী ইরার গাড়িতে মাল পাচার করার পথ বের করেছিল। আর কোনমতে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অনেক ঝুঁকি নিয়ে বের হয়ে গেছল মালপত্র নিয়ে তাদের গোপন ডেরায়।

সহজে ওরা কাউকে ওই খাঁড়ির ধারে পাহাড়ে সেই বাতিল কেল্লার ডেরাটাকে দেখায় না।

ওটা তাদের মূল ঘাঁটি।

শহর থেকে দূরে নির্জন বনে ঢাকা পাহাড়ের নীচে ওদের একটা ফার্ম আছে।

ফার্ম এর চাষবাসের লোকদেখানি ব্যাপারও আছে। ট্রাকটার, চাষের যন্ত্রপাতি কিছু আছে।

পাহাড়ের গায়ের জমিতে কিছু আম, কাজুবাদামের গাছও আছে।

ওই চাষবাসের নামে এই এলাকাটা ইজারা নিয়ে তারা ওই পাহাড়ের পরিত্যক্ত ভাঙ্গা কেল্লাটাকে আসল কাজে লাগিয়েছে।

পর্তুগীজ আমলের কেল্লা।

তখন তারাই সমুদ্রের ধারে নৌবহরের জন্য এই কেল্লা বানিয়েছিল।

তারপর এল মারাঠাদের যুগ।

মারাঠা নৌবাহিনীর সর্বময় কর্তা কনোজী আংরের বীরত্বে সেদিন পর্তুগীজ দস্যুরাও পরাজিত হয়েছিল।

এই কেল্লা এসেছিল তাদের দখলে।

তারপরও কয়েক শতাব্দী কেটে গেছে।

এখানে মানুষজনও আসে না। ওই সমুদ্রের খাঁড়িতে মাছমার কোলিদের দল—দূর থেকে দেখে ওই কেল্লাকে, ভয়ে অনেকেই আসে না।

এখন নতুন সভ্য জলদস্যুর দল কয়েক শতাব্দী পরে ওই কেল্লার দখল নিয়ে নতুন করে ব্যবহার করছে। এমনি গোপন সুরক্ষিত জায়গাটা পেয়ে মিঃ দাশানী ডিকস্টারা

খুশী।

কিন্তু ওই গোপন আস্তানাটা আজ নেহাৎ বিপদে পড়েই মীরাকে দেখাতে হয়েছে।

তাই মীরার উপর বিশেষ করে নজর রাখার দরকার বোধ করে তারা। কোন খবর বের হয়ে গেলে তাদের সর্বনাশ হবে।

মিঃ দাশানী বলে—ডিকস্টা একটা মস্ত ভুল করেছে। ওর ওপর নজর রাখো। বিশেষ করে ওর ওখানে কে আসে কি কথা হয় সব খবর আমার চাই।

ডিকস্টা এসব কাজে খুবই পারদর্শী। তার এসব কাজের জন্য বিশেষ বাহিনীও আছে।

সেদিন সকালেই ইরার ফ্ল্যাটে টেলিফোন ডিপার্টমেন্ট থেকে ওর ফোন ঠিকমত কাজ করছে কিনা চেকআপ করতে আসে।

ইরা তার বাড়ির কাজের মেয়েকে ফোনটা দেখিয়ে দিতে বলে বাথরুমে যায়।

রাতভোর ঘুমুতে পারে নি ইরা আতঙ্কে উত্তেজনায়, তাই স্নান করতে ঢোকে সে।

মেকানিক এর মধ্যে যা যা করার সেইমত ব্যবস্থা করে যায়।

ইরা স্নান সেরে বের হয়ে এসেছে, এমন সময় বেল বেজে ওঠে। ঢুকছে মিঃ লাল।

ইরা ওর পথ চেয়েই বসে ছিল। মিঃ লাল বলে—কি ব্যাপার! জোর তলব কেন ম্যাডামের? কি হলো?

আজ ইরার মনে সেই জমানো কথাগুলো বের হয়।—আমাকে বাঁচাও মিঃ লাল! আমি জানতাম না ওই মিঃ দাবানী ডিকস্টাদের আসল ব্যবসার খবর। ওরা ড্রাগস্, সোনা দানা অনেক কিছু স্মাগলিং করে। কাল রাতে গাড়িতে আসার সময় টের পেয়েছি। ওরা গুলি করে পুলিশের জিপ বিকল করে মালশুদ্ধ আমাকে নিয়ে গেল ওদের গোপন ডেরায় গুজরাট হাইওয়ে ছাড়িয়ে চায়না ক্রিকের ওদিকে পাহাড়ের কোনো পুরানো ফোর্টে।

মিঃ লাল শুনছে কথাটা।

বলে সে—এ-নিয়ে এখন চুপচাপ থাকে মীরা! ওরা যেন জানতে না পারে তুমি কিছু দেখেছো কিছু বুঝেছো!

ইরা বলে—কিন্তু এভাবে থাকা যাবে না লাল!

মিঃ লালও আজ মীরার জন্য দুঃখ বোধ করে। বলে সে—ক'টা দিন চুপচাপ থাকো। ওরা সাংঘাতিক লোক, সহজে ওদের জাল কেটে বের হওয়া যাবে না। তাই চুপ করে সুযোগ খুঁজতে হবে।

ইরা বলে—কিন্তু আমি ওদের ভয় করি না লাল!

—তবু সাবধান থাকা ভালো। কিছুদিনের মধ্যে ব্যাপারটা থিতিয়ে গেলে তখন চলে এসো আমার ফার্মে। দু-জনে পাবলিসিটির কাজ করবো। এতটাকা দিতে পারবো না—তবে দিন চলার ব্যবস্থা হবে। আর শান্তিতে থাকা যাবে।

ইরা বলে—তাই ভালো মিঃ লাল। তবে ওরা যদি ফের আমাকে জড়াতে চায়,

কোনরকম বাজে ব্যবহার করে ওদের আমি ছাড়বো না। পুলিশের কাছে সব খবর —মায় ওদের আস্তানার খবরও পৌঁছে দেব। দেখবো কি হাল হয় ওদের।

মিঃ লাল বলে—ওসব করোনা। অফিস যেমন যাচ্ছো যাবে, জানতে দেবে না তুমিসরে যেতে চাও। সময় হলেই সরে যাবে। এখন নয়।

বেলা হয়ে গেছে।

বোম্বাই শহর জাগ্রত হয়ে উঠেছে। পথে ঘাটে গাড়ি, লোকজনের—অফিসযাত্রীদের ভিড় শুরু হয়েছে। মিঃ লাল বলে—অফিস যাবে তো। চলো, তৈরী হয়ে নাও, পৌঁছে দেব তোমাকে মীরা!

অফিসে এসেছে ইরা।

—গুডমর্ণিং ম্যাডাম! মিঃ দাবানীর সঙ্গে দেখা হতে স্বাভাবিক ভাবেই কথা কথা বলে দাবানী।

ইরা নিজের চেম্বারে ঢুকেছে। আসল কাজই বাকী! ডিকস্টাও এসে কি ফাইল নিয়ে কথা বলে যায়। অফিসের কাজ স্বাভাবিক ভাবেই চলেছে।

কালরাতের ঘটনার কোন ছায়াই পড়েনি। ইরাও অবাক হয়। এদের কাছে এসব ঘটনা যেন অতি সহজ আর স্বাভাবিক ঘটনা।

কিন্তু মিঃ দাশানী ডিকস্টারার দলকে চেনে না ইরা। ওরা গভীর জলের মাছ। বাইরে থেকে ওদের চালচলন, ওদের কার্যপন্থা বোঝার কোন উপায়ই নেই।

ডিকস্টারা তার উপর নজরই নয়, গোপনে আড়ি পেতেছে। ওর ফ্ল্যাটে সেই টেলিফোন মেকানিক সাজা এদের লোক গিয়ে ওদের ঘরে লুকানো টেপ রেকর্ডারও রেখে এসেছিল।

দুপুরে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে খুলে নিয়ে এসেছে তারা ইরার ফ্ল্যাটে আর সেই টেপরেকর্ডারে ইরা আর মিঃ লালের কথাগুলো যা রেকর্ড করা হয়েছিল সেটাও নিয়ে গিয়ে বস্‌কে দেয়।

ডিকস্টা, মিঃ দাবানী টেপটা চালু করে শুনছে ওদের কথাগুলো।

মিঃ দাবানী চাপা স্বরে গর্জে ওঠে—বীচ। এইসব বলেছে সে? পুলিশে খবর দেবে? ও ধরে ফেলেছে আমাদের আসল ব্যবসার কথা!

ডিকস্টা বলে—শুধু তাই নয়, আমাদের এই গোপন ডেরার লোকেশনও জেনে গেছে সে, পুলিশকে যদি খবর দেয় মীরা—

মিঃ দাবনী চাপা স্বরে বলে।—ওকে আর ছাড়া ঠিক হবে না ডিকস্টা।

—ওর ব্যবস্থা করে ফ্যালো। আর সেটা যত তাড়াতাড়ি হয় তত ভালো! আন্ডারস্ট্যান্ড!

ডিকস্টা বুঝেছে কি করতে হবে। বলে সে—তাই হবে বস্!

ইরা জানতেও পারলো না এতবড় খবরটা।

বৈকালে অফিস ছুটির সময় দেখা যায় মিঃ দাশানীকে, তার গাড়িতে উঠছে।

—হাই মীরা!

ইরাও বলে—গুডনাইট স্যার!

—ইরাও এসেছে মিঃ লাল এর চেম্বারে। মহালক্ষ্মী রেসকোর্সের ওদিকে একটা মালটিস্টোরিড বিলডিং-এর সাততলায় ওর অফিস। পাবলিসিটির কাজ এখান থেকেই করে। আর থাকে একটু দূরে খারের একটা অঞ্চলে।

সন্ধ্যা হয় হয়। বোম্বাইএ সন্ধ্যা নামে বেশ দেরীতে। কলকাতায় যখন অন্ধকার, বোম্বাই-এর আকাশে তখনও আলোর প্রকাশ থাকে।

কিন্তু অফিসে মিঃ লাল নেই। ওর সহকারী এক আর্টিস্ট বলে—মিঃ লাল জরুরী কাজে গোরেগাঁও গেছেন, ফিরতে দেরী হবে, দেরী হলে অফিসে আর আসবেন না। ওর বাসাতেই পাবেন ওকে।

ইরা বের হয়ে আসে।

মিঃ লালকে তার দরকার। আজকের অফিসের সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার, ওই মিঃ দাশানী ডিকস্টাদের ব্যবহারের কথাও জানাতে হবে তাকে।

মনে হয় ইরার, ডিকস্টার দল তার মনের কথা জানতে পারেনি। ওরা ব্যাপারটাকে সহজভাবেই নিয়েছে। তাকে কোনরকম সন্দেহ করেনি, ইরা একটু নিশ্চিন্ত হয়।

খারের ফ্ল্যাটে আসে মিঃ লালের সন্ধানে, তখনও ফেরেনি মিঃ লাল। তার কাজের লোকটাকে বলে—এলে খবর দেবে। খুব জরুরী দরকার। আজ রাতে যেন অতি অবশ্যই রিং করেন মিঃ লাল। আর যদি একবার বান্দ্রায় আমার ওখানে যান খুব ভালো হয়।

লোকটা বলে—এলে বলে দেব তাকে মেমসাব, আপনি ফ্ল্যাটে থাকবেন তো!

—হ্যাঁ! উনি যেন একবার রিংও করেন। খবরটা দিয়ে নেমে আসে ইরা।

মিঃ লাল একটা পার্টির জরুরী কাজে বের হয়েছিল। বেশ কয়েকটা বড় স্পেস হার্ডিং-এর কনট্রাক্ট পেয়েছে সে ভালো দামে।

বেশ কয়েকমাসের কাজ।

শহরের মধ্যে কয়েকটা ভালো জায়গা চায় তারা। দাম ভালোই দেবে।

তাই লাল বের হয়েছিল আন্ধেরী থেকে শুরু করে সান্টাক্রুজ এয়ারপোর্টের ধার,

খার, বান্দ্রার মোড়, কিংসসার্কেল, দাদার চৌপাটি, মেরিনড্রাইভ এলাকার কয়েকটা জায়গা দেখে ফিরেছে ফ্ল্যাটে। তখন রাত্রি প্রায় এগারোটা বেজে গেছে।

বাড়ি ফিরতে তার কাজের লোকটা জানায়—মীরা মেমসাব এসেছিলেন। ফোন করতে বলেছেন। কি জরুরী দরকার আছে।

এতক্ষণে লালের মনে পড়ে মীরার কথা। সকাল বেলায় ওর ফ্ল্যাটে গেছল। তারপর আবার কোনও ঘটনা ঘটলো কিনা কে জানে!

তাই বাথরুমে ঢুকে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে পোশাক বদলে বের হয়ে আসে।

সন্ধ্যার পর রাতের ডিনার খাবার আগে মিঃ লাল দুপেগ হুইস্কি নিয়ে বসে।

বেশী মদ খায় না সে। সেদিকে খুবই হিসাবী। মাত্র একা বসে কিছুক্ষণ ধরে তারিয়ে তারিয়ে দিনের সংবাদপত্র নিয়ে দুপেগ মদ্যপান করে খাবার খেতে যায়।

আজও বসেছে গ্লাস নিয়ে।

আয়েস করে দু' এক চুমুক দিয়ে ফোনটা ডায়াল করে। ফোন বেজে চলেছে। কে যেন তোলে।

ডাকছে মিঃ লাল, হ্যালো মীরা—

মীরা জবাব দিতে যাবে, হঠাৎ ওর কণ্ঠস্বর যেন তীক্ষ্ম আর্তনাদে পরিণত হয়। ফোনটা সশব্দে ছিটকে পড়ে।

—হ্যালো মীরা—মীরা!

কোন জবাব নেই। একটা ধস্তাধস্তির শব্দ। কাতরানির শব্দটা ছাপিয়ে কিসের শব্দ ওঠে—যেন একটা চেয়ারই ছিটকে পড়েছে।

উৎকর্ণ হয়ে ওঠে মিঃ লাল—মীরা—মীরা!

কোন জবাব নেই। জোরে কোথায় দরজা বন্ধ করার শব্দ উঠল, তারপর ফোনটাও নীরব হয়ে যায়। চমকে ওঠে লাল।

আর কোন সাড়া আসে না।

ফোনটা ডেড হয়ে যায়। তবু যেন কানে জেগে থাকে মীরারই তীব্র আর্তনাদ।

হয়তো নিশ্চয়ই তার কোন বিপদ হয়েছে।

মিঃ লাল উঠে পড়ে। ওকে পোষাক বদলাতে দেখে কাজের লোক পান্ডুরং বলে—আবার বের হবেন?

—হ্যাঁ, দেরী হলে তুমি খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ো। বের হয়ে যায় মিঃ লাল।

ব্যাপারটা তার কাছে কেমন বিচিত্র বোধ হয়। রাত হয়ে গেছে। মিঃ লাল গাড়ি নিয়ে এসেছে ইরার ফ্ল্যাটে। বড় বাড়িটা। আরও অনেক ভাড়াটে আছে। কিন্তু শুধু বোম্বাই শহর কেন, সব শহরেই ওই বিরাট বাড়িগুলোর বাসিন্দারা একই ছাদের তলায় থাকে সত্য, কিন্তু পরস্পরের কাছ থেকে বেশ দূরে দূরেই থাকে প্রত্যেকে।

মিঃ লাল উঠে গিয়ে ওর দরজায় বেল বাজায়। কিন্তু বেল বেজেই চলে, দরজা কেউ খোলে না। নীচে নেমে ফোন করে। ফোনের লাইন বোধ হয় খারাপ হয়ে গেছে কোন সাড়া নেই।

তাই পুলিশ স্টেশনেই ফোন করে মিঃ লাল এখানের ঠিকানা জানিয়ে। তার মনে হচ্ছে ওই ফ্ল্যাটে কোন অ্যাকসিডেন্ট ঘটে গেছে।

ওই বড় বাড়ির দু পাশেই কৌতূহলী ভাড়াটেও জুটে যায়, পুলিশ আসতে দেখে তাদের অনেকেই একটু বিব্রত বোধ করে।

তাই সরে যায় তারা।

সরে গেলেও বেশ নিরাপদ দূরত্বে থেকে তারা দেখছে ব্যাপারটা।

মিঃ লাল পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে লিফটে করে পাঁচতলার একটা ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে বেল বাজালো।

বেল বেজেই চলেছে।

কোন সাড়া নেই।

পুলিশও দরজায় ধাক্কা মারে, তবু সাড়া মেলে না। শেষ অবধি দরজা ভাঙ্গার সিদ্ধান্তই নেয় পুলিশ। চেষ্টা করেও তালা খোলা যায় না। বিলাতী লকটা বেশ জম্পেশ হয়ে জমে গেছে। দরজা ভাঙ্গার চেষ্টাই করছে তারা।

তারা এসে দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে দেখে বিছানায় মীরার প্রাণহীন দেহটা পড়ে আছে। নাক মুখে ক্ষীণ জমাট রক্তের ধারা, আর কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। কারা রাতের বেলায় মীরাকে তার বেডরুমে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে।

মিঃ লাল চমকে ওঠে। বেশ বুঝেছে সে এ কাদের কাজ। ওই অন্ধকারের জীবগুলো বুঝেছিল মীরা তাদের অনেক খবর জেনেছে, তাই তার মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ করে গেছে এইভাবে। কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণও রাখেনি ওই খুনীর দল।

নিরীহ একটি মেয়েকে প্রাণ দিতে হলো ওদের হাতে বিনা কারণে। রাত্রি নামে বোম্বাই-এর আকাশে।

রাত্রি নেমেছে কলকাতার বুকে। একই তারকার রোশনী জ্বলে আকাশে। এক প্রান্তে এ বেদনায় জ্বালাময়, অন্য প্রান্তে কি পূর্ণতর তৃপ্তিতে প্রোজ্জ্বল।

সুবিনয় হাসপাতাল থেকে ড্রেস করে ফিরেছে। ইরার কাছে আজ সুবিনয় কৃতজ্ঞ। মনে হয় দীর্ঘ এই বিবাহিত জীবনে সুবিনয় প্রতিদিনের ব্যবহারে ইরাকে অবজ্ঞাই করেছে। শুধুমাত্র লেখাপড়া আর কলেজ, ছাত্র এই নিয়েই ছিল। ইরা একাই অক্লান্ত পরিশ্রমে এই সংসারের বোঝা টেনেছে, নিজে রোজগার করে সংসারের অভাব মিটিয়েছে, আর সুবিনয় স্বার্থপরের মতো নিজের জগৎ নিয়ে ভুলে ছিল, নিজের শত্রুপক্ষ তাই তাকে চরম লাঞ্ছনার মধ্যেই ফেলেছে—আর সেখানে থেকে উদ্ধার করেছে তাকে ইরাই পতিব্রতা স্ত্রীর মতই!

—ইরা!

সুবিনয়ের ডাকে চাইল ইরাবেশী মীরা। শুভা, বিমু ঘুমিয়ে পড়েছে। মীরা সুবিনয়কে ওষুধ খাইয়ে ওর বিছানাটা ঠিক করে নিজের ঘরের দিকে চলেছে, সুবিনয়ের ডাকে চাইল মীরা। সুবিনয় বলে—এতদিন ধরে তোমার উপর অনেক অবিচার

করেছি ইরা। তুমি আমায় ক্ষমা করো।

সুবিনয় মীরাকে আজ কাছে পেতে চায়, সব অপরাধের জন্য ক্ষমা পেতে চায় সে। চমকে ওঠে মীরা। এতদিন ধরে নিরাপদ দূরত্বে থেকেছে, আজ সুবিনয় নিজের দোষ স্বীকার করে স্বামী-স্ত্রীর সেই হারানো সম্পর্ককে ফিরে পেতে চায়। একটি পুরুষের এই আন্তরিক আহ্বান আজ মীরার বঞ্চিত ব্যর্থ নারী-মনে সব শূন্যতা ছাপিয়ে কি সাড়া আনে।

সুবিনয় আজ এতদিন পর ইরাকে ফিরে পেতে চায়। রাত্রি নেমেছে।

শান্ত তারকিনী রাত্রি। রাতের বাতাস গাছগাছালির বুকে মাতন আনে, তারই সাড়া আজ সুবিনয়ের মনে। বলে সে—তুমি আমাকে ভুল বুঝে দূরে সরে থেকো না ইরা। যার জন্য এত করেছো, যে সত্যকে তুমি নিজে প্রকাশ করেছো—তাকে তুমি এখন মেনে নিয়ে সরে থাকবে? ইরা!

ইরা রূপী মীরার মনে এই নিশীথ রাত্রির আহ্বান কি বিচিত্র সাড়া জাগায়। মীরা একদিন অতীতে সুবিনয়কে ভালোবেসেছিল—সেই ছিল তার জীবনে প্রথম স্বপ্নপুরুষ। কিন্তু ইরাই তার জীবন থেকে সুবিনয়কে সরিয়ে নিয়েছিল।

আজ আবার সেই আহ্বান মীরার সারা মনে ঝড় তোলে, পুরুষের সান্নিধ্য তার জীবনে নতুন নয়। কিন্তু যাকে ভালোবাসে তার ডাক আজ যেন প্রথম শুনেছে মীরা।

—ইরা! সুবিনয়ের হাতখানা ওর হাতে। সেই নীরব স্পর্শ মীরার মনে ঝড় তোলে।

কিন্তু সে ইরা নয়, মীরা। অন্য জন। সুবিনয়ের সব প্রেম ভালোবাসা আজও ইরাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত, তবু মীরার চিরন্তন নারীমন আজ ছদ্মবেশেই সেই ডাকে সাড়া দিতে যায়।

কিন্তু সরে থাকে তবু মীরা। তার অন্যমন ইরার হয়ে ওই ভালোবাসার স্পর্শ পেতে চায় না, ইরাকে সে ঠকাতে পারবে না।

কিন্তু এ এক জটিল পরিস্থিতি গড়ে উঠেছে। সুবিনয় আজ নিজের স্ত্রীকে নিঃশেষে ফিরে পেতে চায়। তাই যেন নিবিড় স্পর্শে ইরাকে কাছে টেনে নেয়।

—ইরা!

মীরাও আজ যেন সব ভুলে তার নিঃস্ব রিক্ত জীবনকে ক্ষণিকের জন্যও সার্থক করে তুলতে চায়।

সুবিনয়ের ওই ছোঁয়া তার মনের সব বাধাকে যেন নিঃশেষে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। সেও ওই আহ্বানে যেন এগিয়ে আসে। মীরার সব চেতনা, শক্তি যেন লোপ পেয়েছে।

ইরা!

মীরা যেন সব হারিয়ে আজ ইরাতেই পরিণত হয়েছে। সেই চেতনার গভীরে সে হারিয়ে যেতে চায়।

সুবিনয় আজ ফিরে পেয়েছে তার ইরাকে, সারা মন দিয়ে তাকে কাছে পেতে

চায় আজ, পুরুষ প্রকৃতির নিখুঁত কামনার স্বপ্নে আজ দুজনেই হারিয়ে যেতে চায়।

হঠাৎ তীক্ষ্ণস্বরে ফোনটা বেজে ওঠে। রাতের স্তব্ধতা ভেদ করে বাজছে ফোনটা। কে যেন ব্যাকুল হয়ে ডাকছে!

সচকিত চাহনিতে চাইল মীরা।

সুবিনয়ও দেখছে বিরক্তি ভারে। বলে সে—এত রাতে কে ফোন করছে!

মীরা এসে ফোনটা ধরে—হ্যালো।

বোম্বাই থেকে কথা বলছে মিঃ লাল।

মীরা অবাক হয়—মিঃ লাল। এত রাতে?

মিঃ লাল আজ সেই সর্বনাশা খবরটা জানায় এখানে—মিসেস ঘোষ—আপনার বোন মীরাকে কারা আজ রাতে তার ফ্ল্যাটে খুন করে গেছে।

চমকে ওঠে মীরা। অজানতেই বলে ওঠে সে—মিঃ লাল। ও মীরা নয়—ও আমার বোন ইরা। ইরাকে কারা খুন করলো? কেন?

মিঃ লালও অবাক হয়। —সেকি! তাহলে ও মীরা নয়—তোমার বোন! কেন খুন হ'ল তা সঠিক জানি না, ফোনে বলাও যাবে না। পুলিশ তদন্ত করছে।

মীরা কিছুটা অনুমান করেছে এ কাদের কাজ। তাদের সে ভালো করেই চেনে, জানে। ইরাকে সে ওদের সম্বন্ধে এতটা সাবধান করে দেবার কথা ভাবেনি, তাই এই চরম সর্বনাশ ঘটে গেছে।

মীরা বলে—আমি আসছি ওখানে। কালই—

সুবিনয় কথাটা শুনেছে। শুনেছে মীরা নয়, ইরাকে কারা খুন করেছে বোম্বাই-এ। চমকে ওঠে সুবিনয়।

যাকে ভালোবেসেছে সে ইরা নয়, তার স্ত্রী নয়! অন্যজন। সে মীরা।

ওই মেয়েটি তার স্ত্রীর অভিনয় করে তার বিশ্বাস অর্জন করে আজ তার ভালোবাসা নিয়ে ছেলেখেলা করেছে। তাকে ঠকিয়েছে। সে চোর, ঠক!

শুধু তাই নয়। তার জঘন্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য আজ তার স্ত্রী ইরাকে প্রাণ দিতে হয়েছে দূরে অজানা শহরে। সব তার হারিয়ে গেল। আর সে সব কিছুর জন্য দায়ী ওই মেয়েটি!

মীরার মনে আজ তীব্র গ্লানি, কি অনুশোচনা জেগে ওঠে।

আজ তার ভুলের জন্য, তাদের নিষ্ঠুর খেলার জন্য এমনিভাবে দাম দিতে হবে তা ভাবেনি, ওর চোখে জল নামে।

হঠাৎ সুবিনয়কে সামনে দেখে চাইল।

সুবিনয় বলে—কেন, এই কাজ করলে কেন? ইরা তোমার কি ক্ষতি করেছিল যে তাকে বোম্বাই শহরের মোহ অন্ধকারে আটকে রেখে নিজে এসে তার সংসারে এই সর্বনাশা খেলা খেলেছিলে? কেন?—কেন এই নাটক করেছিলে? যার জন্য ইরাকে প্রাণ দিতে হলো?

মীরা বলে—এ আমি চাইনি সুবিনয়বাবু, ইরাই আমাকে এখানে পাঠিয়েছিল।

—চুপ কর! গর্জে ওঠে সুবিনয়।—তুমি একটা চোর, ইতর বাজে মেয়ে। খুনী!

মীরা বলে অনুতপ্ত কণ্ঠে—যা খুশি তাই বলতে পারেন আমাকে কিন্তু খুনী আমি নই। বরং যারা আমার বোনকে এভাবে খুন করেছে তাদের আমি ছাড়বো না।

সুবিনয় বলে—থাক। আর দরদ দেখাতে হবে না। তোমার লোভের জন্যই আজ আমার সব হারিয়ে গেল! আমাকে ঠকিয়েছো তুমি, ইরাকে শেষ করেছো। কিন্তু ওই শিশু যারা আজও জানে তাদের মা বেঁচে আছে, তাদের কি জবাব দেব আমি! তারা জানলো না—যে মা সেজে এসেছিল, মেকি স্নেহ দিয়েছিল, সে একটা ঠগ্ প্রতারক। তাদের মাকে সেইই খুন করিয়েছে নিজের স্বার্থে। কিন্তু সেই চালাকিও ধরা পড়ে গেছে।

মীরা বলে—বিশ্বাস কর—

বলে সুবিনয়—থাক, আর বিশ্বাসে কাজ নাই। তুমি এ বাড়ি থেকে আজই চলে যাও ভোর হবার আগে। ওই ফুলের মত নিষ্পাপ শিশুদের তোমার শয়তানি দিয়ে আর সর্বনাশ করো না। ছিঃ ছিঃ—ছিঃ। এতবড় ভুল করেছিলাম আমি। তুমি যাও—দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে।

সুবিনয় ওঘরে চলে যায়। রাগে দুঃখে অপমানে সে দিশেহারা হয়ে গেছে। ভাবতেই পারে না সুবিনয়, এতবড় একটা মিথ্যার শিকারে পরিণত হয়ে তার এতবড় সর্বনাশ ঘটে যাবে।

ঘুমুচ্ছে শুভা, বিমু। ওরা জানে না ওদের জীবনে কি সর্বনাশ নেমে এলো।

সুবিনয় ভাবছে!

আজ চরম সর্বনাশের সামনে তাকে দাঁড়াতে হবে।

বোম্বাই-এ ইরা মারা গেছে। তাই তাকে যেতেই হবে বোম্বাই-এ।

সুবিনয় ভাবছে।

এসব কথা সে বাড়িতে কাউকে বলবে না। শুভা, বিমুকেও জানাবে না এতবড় সর্বনাশের কথা।

একাই যাবে সে বোম্বাই-এ, ব্যাপারটা নিজে গিয়ে সব দেখে আসবে। ভাবতেই পারছে না ইরা আজ নেই।

সকালে সুবিনয়কে বাইরে যাবার জন্য তৈরী হতে দেখে বলে বনমালী।—সকালে কোথায় বের হবে?

বলে সুবিনয়।—একটা জরুরী কাজে বোম্বাই যেতে হচ্ছে। কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরবো। ক'দিন শুভা বিমুদের দেখভাল করো।

মীরা বের হয়ে গেছে সকালেই। আজ তার জীবনেও একটা আমূল পরিবর্তন

এসেছে। ভাবতে পারে না ইরা নেই।

আজ মনে পড়ে মীরার মিঃ দাশানী, ডিকস্টাদের কথা। ওদের অন্ধকারের ব্যবসা ব্যাপারটা সেও জেনেছিল, কিন্তু ইরা যে এমনিভাবে শেষ হয়ে যাবে ভাবতে পারেনি, মীরার স্থির বিশ্বাস যে এসব ওই দলেরই কাজ। আর তাদের এবার ছেড়ে দেবে না মীরা। নিরপরাধ ইরাকে খুন করার জবাব সে দেবে। তাই কঠিন এক সংকল্প নিয়ে সে বোম্বাই-এ ফিরে চলেছে। এই কাজ তাকে করতেই হবে।

তার জন্য যত বিপদই আসুক না কেন সে থামবে না।

বোম্বাই পুলিশের রেকর্ডে আর একটা খুনের সংখ্যা বাড়ল মাত্র।

মহানগরের বুকে এমন খুন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। তার জন্য তদন্ত যা করার কতটা করা হবে কে জানে।

মিঃ লালও থানায় গেছে। সেখানেই এসে পড়েছে সুবিনয়।

মিঃ লালই ফোন করেছিল সুবিনয়ের বাড়িতে। সুবিনয়কে মিঃ লালই সাহায্য করে।

পোস্টমর্টেম-এর পর ডেডবডিটা নিয়ে আসে ওরা জুহুর সমুদ্রতীরে। সুবিনয় আজ শোকে দুঃখে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

বৈকাল নামে সমুদ্রতীরে।

মাদ্ আইল্যান্ড-এর সবুজ গাছগাছালির বুকে শেষ সূর্যের ম্লান আলো পড়েছে। পাখীরা ঘরে ফেরে। ঘর থেকে দূর প্রবাসে এক বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে ইরা আজ হারিয়ে গেল তার জীবন থেকে চিরকালের জন্য।

মিঃ লালই তার পরিচিত কয়েকজনকে এনেছে। দূর প্রবাসে ইরা এক অপরিচিতের জগতে এমনি করে হারিয়ে গেল।

হঠাৎ ওই কয়েকজনের ওদিকে আর একজনকে দেখে চাইল সুবিনয়।

সে মীরা।

মীরাও এসেছে একই প্লেনে।

দমদমে উঠেছে সেও।

চেষ্টা করে এয়ারবাসটার পেছন সারিতে বসেছিল মীরা! সুবিনয় তাকে দেখতে পায়নি।

মীরা থাকতে পারেনি। তাই এসেছে খোঁজ নিয়ে শ্মশানেও। আজ ওই ইরার জ্বলন্ত চিতার সামনে দাঁড়িয়ে সে যেন শপথ নেয় যে ভাবেই হোক ওই শয়তানদের শেষ করতেই হবে। সুবিনয় এর জন্য নয়, নিজের বিবেকের কাছে তাকে সাফ্ থাকার জন্য এই কাজ করতেই হবে।

মিঃ দাশানী ডিকস্টার দল ইরাকে শেষ করে বাধা মুক্ত হতে চেষ্টা করেছে।

তবু তারা নজর রেখেছে চারিদিকে।

ওদের লোক তাই সাধারণ দর্শকদের ভিড়ে মিশে এসেছে এখানে।

এবার তাদের নজর মিঃ লালের উপর। তারা জানে মিঃ লাল ওই মেয়েটার ঘনিষ্ঠ ছিল। আর টেপের কথার মধ্যে তারা মিঃ লাল-এর কথাও শুনেছে। ও জেনেছে সব কিছু। ও যেন পুলিশের কাছে মুখ না খোলে তাই তাকেই এবার সরিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু হঠাৎ ওই সমুদ্রের ধারে মীরাকে দেখে তারা অবাক হয়।

তারা খুন করেছে যাকে—যার শবদেহ দাহ করা হচ্ছে সে যেন সশরীরে জীবন্ত হয়ে উঠছে তাদের সামনে।

ডিকস্টার বিশ্বস্ত সহায় জন ব্যাপারটা দেখে চমকে ওঠে। যেন প্রেতাত্মাকে দেখছে সে।

মা মেরীকে স্মরণ করে জন সরে আসে। কে জানে 'ইভস্ গোস্ট' অর্থাৎ ওই মৃত মেয়েটার শয়তান ভূতই তার ঘাড় মটকাবে কিনা কে জানে।

এতবড় সাহসী, পেশাদার খুনেও ভূতের ভয়ে কাবু হয়ে ছুটে এসেছে ডেরায়।

ডিকস্টা বলে, কি ব্যাপার জন? মেয়েটাকে পুড়িয়ে দিয়েছে তো? যাক্, ঝামেলা মিটল তাহলে?

জন বলে—না বস্! মেয়েটাকে জ্যান্ত হয়ে ঘুরতে দেখলাম চিতার পাশেই। ও মরেনি।

—হোয়াট! গর্জে ওঠে ডিকস্টা।

মিঃ দাশানী বলে—সে কি! তাহলে মারলে কাকে? আর মরে গেলে বেঁচে উঠবে কেমন করে? ইউ ড্রাংক ফুল—মদ গিলে মাতাল হয়েছিলে নাকি?

জন বলে—নো বস। 'জন' এক পিপে মদ গিললেও মাতাল হয় না। আমি ঠিকই দেখেছি মেয়েটা বেঁচে আছে।

মিঃ দাশানী বলে—খবর নাও ডিকস্টা! ওর সেই যমজ বোন নয় তো? কাকে মেরেছো তাহলে? যদি তাই হয়—ওটার খবর নাও। একটা খুন কেন, দরকার হলে বাড়ী দুটোকেও শেষ করতে হবে। ওই মিঃ লালকেও!

সুবিনয় ঠিক জানে না হত্যার কারণটা। পুলিশও তদন্ত করছে।

তদন্তকারী অফিসারই বলেন সুবিনয়কে—আমরা তদন্ত করছি। দু'একটা দিন যদি বোম্বাই এ থাকতে পারেন ভালো হয়। আপনার স্টেটমেণ্টও রেকর্ড করতে হবে।

তাই সুবিনয়কে একটা হোটেলেই থাকার ব্যবস্থা করে মিঃ লাল। ওর ফ্ল্যাটের নাম্বার, টেলিফোন নাম্বার দিয়ে বলে মিঃ লাল—কাছেই থাকি, অসুবিধা বোধ করলে ফোন করবেন, চলেও আসতে পারেন।

সারা রাতদিন শরীরের উপর ধকল গেছে মিঃ লালের। এসব কাজ চুকিয়ে ফ্ল্যাটে ফিরে মীরাকে দেখে অবাক হয় মিঃ লাল।

তার চোখেও ধাঁধা লাগে! ক্রমশ ব্যাপারটা বুঝে বলে সে—মীরা! তুমি!

মীরার চোখে জল।

আজ মীরা বলে—হ্যাঁ। একটা খেলা খেলতে গিয়ে এমনি বিপর্যয় আসবে চারিদিক থেকে তা ভাবিনি মিঃ লাল।

মিঃ লাল বলে—এখেলার কি দরকার ছিল মীরা?

মীরা বলে—বিশ্বাস কর মিঃ লাল, এ আমি চাইনি। ইরাই নিজে এই খেলায় মেতে উঠেছিল, আর ওই শয়তানদের হাতে শেষ হয়ে গেল। এবার ওই শয়তানদের শেষ করবো আমিই।

মিঃ লাল চমকে ওঠে।—কি বলছো মীরা।

মনে পড়ে মিঃ লালের ইরার কথাগুলো। ইরাও এমনি করে ওই শয়তানদের শেষ করার কথা বলেছিল মাত্র, আর সেই খবর কি করে তাদের কাছে পৌঁছে গেল কে জানে। তারপর এই সর্বনাশ ঘটেছে।

মিঃ লাল বলে—ওই শয়তানদের তুমি চেন না মীরা, ওরা তোমাকেও ছাড়বে না।

মীরা বলে—আমার আর কি সর্বনাশ করবে মিঃ লাল। ইরাকে শেষ করেছে; তার ছেলেমেয়েরা তাদের মাকে হারালো। আর আমার কেউ তো নেই যে মৃত্যুর পর চোখের জল ফেলবে। তাই আমাকে এতবড় অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতেই হবে।

মিঃ লাল বলে—ওরা আমার উপরও নজর রেখেছে। হয়তো আমাকেও শেষ করবে।

মীরা আজ দেখছে মিঃ লালকে। বোম্বাই-এর নিঃসঙ্গ জীবনে ওই ছিল তার সঙ্গী, বন্ধু, বিপদে আপদে পাশে দাঁড়িয়েছে। আজ মীরার কোথাও যাবার স্থান নেই। এরপর বোম্বাই-এ ওই ফ্ল্যাটেও তার ঠাঁই হবে না, ওই শয়তানদের চাকরীও নেই।

মীরা বলে—না! মিঃ লাল আজ এত সহজে ওরা তোমাকে ছুঁতেও পারবে না। একদিন তুমিই বলেছিলে তোমার ফার্মে জয়েন করতে। দুজনের চেষ্টায় এবার আমরা নতুন করে বাঁচবো। ওই শয়তানদের তাই শেষ করতেই হবে।

মিঃ লালও তাই চায়। নাহলে তারা বাঁচতে পারবে না। তবু বলে সে—একাজে কত বিপদ তা জানো মীরা?

মীরা বলে, এ কাজ না করলেও বিপদ থেকে বাঁচা যাবে না লাল। হয় ওরা বাঁচবে নাহয় আমরা। তাই পুলিশেই যেতে হবে, সব খবর আমি জানি ওদের। এবার পুলিশকে সবই জানাবো। আর দেরী করা ঠিক হবে না। ওরা সাবধান হবার আগেই সব কাজ শেষ করতে হবে।

মিঃ লালও ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝে, তাই ওরা বের হয়ে যায় তখুনিই।

মিঃ দাশানীর লোকজন এসে পড়েছে তৈরী হয়ে, ওদের জাল অনেক দূর অবধি ছড়ানো। ওরা জানে সেই জাল কেটে ওই চুনোপুঁটির মত মিঃ লাল বের হয়ে যেতে

পারবে না। ওরা নজর রেখেছিল মিঃ লালের উপর। ও ফ্ল্যাটে ফেরবার একটু পরেই তারা এসে হানা দিয়ে মিঃ লালকেও পরপারে পাঠাবার পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দেবে।

ওদের কাছে সবরকম তালার চাবিই থাকে। ওরা বড় বাড়িটার সেই নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটে উঠে এসে মাস্টার কি দিয়ে তালা খুলে ভিতরে ঢুকেছে সাবধানে।

আলোটা নেভানো।

ওরা আলো জ্বালে না।

টর্চের আলোয় রেশমী দড়ির ফাঁসটা তৈরী করে ওরা বেডরুমের দিকে এগোয়।

ঘুমন্ত মানুষকে ওই ফাঁস লাগিয়ে দমবন্ধ করে ওরা শেষ করে দেয়। কেউ জানতেও পারবে না—লোকটা ও। শান্তিতে সে চিরনিদ্রার কোলে ঢলে পড়বে।

কিন্তু অবাক হয় তারা।

বিছানাটা খালি, কেউ নেই। ওরা এঘর, ওঘর, বাথরুম তন্ন তন্ন করে খোঁজে। দেখে একটা ভি-আই-পি ব্যাগ নামানো আছে। সঙ্গের নেম কার্ডটায় লেখা মীরা রায়।

সেই সঙ্গে মীরার পুরানো কোম্পানীর দেওয়া সেই ফ্ল্যাটের ঠিকানাও।

ওরা একটু অবাক হয়। জন বলে—এ সেই মেয়েটার ব্যাগ। তাহলে ও মরেনি, মরেছে সেই যমজ বোনটা, এটা দেখছি বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছে, এখানে এসে জুটেছে।

অন্যজন বলে—তাই তো দেখছি, কিন্তু গেল কোথায়। যুগলে ? পেলে দুটোকেই শেষ করতাম !

জন বলে—যাবে কোথায় ? ফিরে আসবেই। একটু বাইরে অপেক্ষা করতে হবে। ফিরে এসে দুটোকেই খতম করে যাবো।

পুলিশও এবার নড়ে চড়ে বসেছে। বোম্বাই শহরের অবস্থা যেন আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। তিনদিকে সমুদ্র, সমুদ্র পথে ব্যাপক স্মাগলিং চলেছে, ড্রাগস্-এর বিষ সারা শহর ছেয়ে ফেলেছে। আসছে বিদেশী জিনিসপত্র সোনা অনেক কিছু। তাকে কেন্দ্র করেই বিচিত্র খুন জখমও ঘটছে।

ইরার মৃত্যু নিয়েও বেশ জল ঘোলা হয়েছে। পুলিশের অকর্মণ্যতা নিয়ে কাগজওয়ালারাও সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

পুলিশ কমিশনারও বিব্রত বোধ করেন। কিছু মাল ধরা পড়েছে মাত্র, দু'একজন চুনোপুঁটিই ধরা পড়েছে। কিন্তু দলের বড় কর্তাদের কেউ ধরতে ছুঁতেও পারেনি, তারা গভীর জলের মাছ। জলের অতলে থাকে, সহজে ধরা যায় না। তাদের না ধরতে পারলে এই সব বেআইনী কাজ কারবার থামানোও যাবে না।

এমনি সময় মীরা আর লালকে আসতে দেখে চাইলেন।—আপনারা ?

মীরা বলে—ওই ইরা রায়ের খুনীদের আমি চিনি, জানি। আমি ওর বোন।

পুলিশ কমিশনার মিঃ ভোঁসলে দুঁদে অফিসার। তিনি দেখছেন মীরাকে। ওর চেহারায় শোকের স্তব্ধতা !

মিঃ ভোঁসলে বলেন—ওর স্বামীও এসেছেন, কিন্তু আপনি কি জানেন এই খুনের ব্যাপার ? কারা একাজ করেছে, কেন ?

মীরা বলে—তারা আরও খুন করার জন্য তৈরী হয়ে আছে। তাদের লোককে দেখতে পাবেন মিঃ লালের ফ্ল্যাটের আশপাশেই, তারা এ শহরে আসল খুনের নায়ক।

—কারা তারা ?

মীরা বলে—তারা খুবই নামী লোক। তাদের অফিস—তাদের মালপত্র রাখার আস্তানার সব খবর আমি জানি !

মিঃ লাল বলে—গত সপ্তাহে আপনাদের একটা পুলিশ জিপের সঙ্গে ওদের এনকাউন্টার হয়েছিল বড়িভিল নাকার কাছে, টায়ার ফাঁসিয়ে তারা পুলিশ জিপ অকেজো করে পালায়—

সহকারী কমিশনার বলে—হ্যাঁ স্যার, গাড়িটাতে মাল ছিল ওদের। চেজ করেও ধরা যায়নি সেই রাতে ! একটি মহিলাও ছিল।

মীরা বলে—সেইই আমার বোন ইরা।

মিঃ লাল বলে—সেই মেয়েটি ওদের গোপন কারবারের বেশ কিছু খবর জেনে ফেলে পুলিশকে জানাবো বলায় তারা তাকে শেষ করেছে।

—আই সি। মিঃ ভোঁসলে এবার যেন আশার আলো দেখতে পান।

বলেন তিনি মীরাকে—আপনি চেনেন, জানেন ওদের ? ওদের গোপন আস্তানা চেনেন !

মীরা বলে—হ্যাঁ !

মিঃ ভোসলে বলেন—সব রকম প্রটেকশন দেবে পুলিশ আপনাদের !—আপনি নির্ভয়ে সব বলুন। আমরা চাই ওই ক্রিমিন্যালদের সাজা হোক ! এটুকু সাহায্য করুন পুলিশকে।

মীরা বলে—তাই দেবার জন্যই এসেছি। আমিও চাই ওরা ধরা পড়ুক !

পুলিশ কমিশনার এর মধ্যে মিঃ লালের ফ্ল্যাটের ঠিকানা জেনে ইনটারকামে কাকে কি নির্দেশও দেন, একজন অফিসার মিঃ লালকে ডেকে নিয়ে গেল তারপরই।

সুবিনয় এসেছিল পুলিশ হেডকোয়ার্টারে, সেও এসে বুঝেছে, ইরা তার অজান্তেই শহরের অন্ধকার জগতের লোকদের বিরাগভাজন হয়ে পড়ে। তাই তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

সে গেছে, কিছু করার নেই। কিন্তু মীরা আজ ছুটে এসেছে এখানে পুলিশকে সেই জগতের মানুষগুলোর সম্বন্ধে সব গোপন খবর দিতে।

মীরা সুবিনয়কে দেখে বের হয়ে এসেছে। আজ সুবিনয়ও বুঝেছে কত বড় চরম বিপদের ঝুঁকি নিতে চলেছে মীরা।

ওই শয়তানের দল তাকে শেষ করবে। সুবিনয়ও তা বুঝেছে আজ। মীরাকে আবার ওদের হাতে শেষ হতে দিতে চায় না সে।

তাই ওপাশের বারান্দায় মীরাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে যায় সুবিনয়—মীরা!

চাইল সে, সুবিনয় বলে—যা হবার তা হয়ে গেছে। একজন তো গেল, তুমি আবার জেনে শুনে সেই আগুনে হাত দিতে চলেছ কেন? নিজে বাঁচার চেষ্টা করো।

মীরা চাইল, ওর শীর্ণ ক্লান্ত মুখে মলিন হাসি ফুটে ওঠে। বলে মীরা—বাঁচা! আমার কাছে মরা বাঁচা সমান সুবিনয়বাবু, বাঁচার কোন আশ্বাসই যার নেই, মরার আগে তবু একটা কাজ শেষ করে যেতে চাই। ইরার আত্মা তাতে শান্তি পাবে। ওর, মৃত্যুর শোধ আমাকে নিতেই হবে। তাই এ কাজ আমাকে করতেই হবে।

জনের দল মিঃ লালের ফ্লাটের বাইরে ওঁৎ পেতে আছে। মিঃ লালকে গাড়ি নিয়ে ফিরে আসতে দেখে ওরা তৈরী হয়, জন বলে—শালা একা এল যে!

অন্য একজন বলে—এটাকেই শেষ করি তারপর সেটাকে দেখা যাবে, ওরা জানে না মিঃ লালকে পুলিশ আজ টোপ হিসাবেই ব্যবহার করেছে।

মিঃ লাল একা উঠে এসে ফ্ল্যাটে ঢুকেছে—পিছু পিছু এসেছে জনের দল। ওরা তৈরী হয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকতে যাবে, এমন সময় পুলিশ এসে ঘিরে ফেলে তাদের।

পুলিশ এভাবে তাদের ঘিরে ফেলবে তা ভাবতেও পারে না এরা।

'জন' কোনমতে পাইপ ধরে নীচে নেমে পালায় পুলিশের জাল কেটে, বাকীগুলো ধরা পড়ে যায়। পুলিশ আজ হাতে-নাতে ধরেছে তাদের। হেড কোয়ার্টারে ওয়ারলেসে খবর আসে—অপারেশন সাকসেসফুল!

অর্থাৎ এদের দেওয়া খবর সত্যি!

মিঃ লাল ভাবতে পারেনি যে তারা তাকেও আজ খুনই করতে এসেছিল।

পুলিশ কমিশনার বলেন মিঃ লালকে—একটা দলের কয়েকজনকে মাত্র ধরেছি, এর-পর আসল অপারেশন শুরু হবে মিঃ লাল।

পুলিশ হেডকোয়াটার্সে ব্যস্ততা শুরু হয়। আজকের সুযোগ তারা ছাড়তে রাজী নয়। যে ভাবে হোক ওই শয়তানদের ধরতেই হবে।

মিঃ দাশানী, ডিকস্টার দল তখনও জেগে আছে। ওরা অপেক্ষা করছে মিঃ লাল-এর মৃত্যুর খবরের জন্য। ব্যস্ত হয়ে পায়চারী করছে। গজগজ করে। বাস্টর্ডরা এখনও ফিরলো না?

ছুটে এসে ঢুকলে জন। হাত-পা ক্ষতবিক্ষত। ওকে দেখে চাইল দাশানী।

—কি খবর জন? ওরা বলে।

জন বলে—সর্বনাশ হয়ে গেছে বস্! পুলিশ।

—পুলিশ!

—পুলিশ সব মালুম পেয়ে গেছে। ওদের এ্যারেস্ট করেছে। কোনরকমে পালিয়ে এসেছি।

মিঃ দাশানী গর্জে ওঠে—ইউ বাস্টার্ড এখানে কেন এলি? পুলিশ তোকে ফলো করেনি কি করে জানলি? এখন!

হঠাৎ বাইরে কয়েকটা গাড়ি থামার শব্দ ওঠে।

পুলিশ সত্যিই তাকে ফলো করে সোজা এদের শহরের মধ্যে এই ঘাঁটিতে এসে পৌঁচেছে।

ডিকস্টা গর্জে ওঠে—ফায়ার!

বাধা দেয় দাশানী—না। ডিকস্টা, এখান থেকে পিছনের পথ দিয়ে বের হয়ে চল। এখানে এসে পুলিশ কিছুই পাবে না। আমাদের সেই পাহাড়ের ডেরাতে যে ভাবে হোক পৌঁছতে হবে। লাখ লাখ টাকার হেরোইন, ব্রাউন সুগার আছে ওখানে। যেভাবে হোক ওই মাল নিয়ে পিছনের সমুদ্রের খাঁড়িতে রাখা লঞ্চে করে পালাতে হবে। পুলিশের হাতে ধরা দেব না। কুইক!

ওদের পালাবার পথ বেশ কায়দা করে তৈরী। তাই এখানে পুলিশ ঢোকার আগেই ওরা সেই পথে বের হয়ে পালায় দলের অধিকাংশরাই।

কিছু চুনো পুঁটিকে বলে—পুলিশকে সহজে ঢুকতে দিবি না।

পুলিশও এগোবার চেষ্টা করে, এরাও বাধা দেয়। গুলি চালায়।

এই নাটকের মধ্য দিয়ে দাশানী, ডিকস্টার দল বের হয়ে রাতের অন্ধকারে পালায় তাদের আসল ডেরা সেই সমুদ্রের ধারের পাহাড়ের পুরোনো কেল্লায়।

পুলিশ কমিশনার মিঃ ভোঁসলে প্ল্যানটা বেশ নিখুঁতই করেছেন।

তিনি জানতেন ওরা যে যেখানেই থাকুক বাধা পেলে পালাবে আর কেন্দ্রীভূত হবে ওই মূল আস্তানায়। সেই আস্তানার খবর তিনি জেনেছে মীরাদের এখানে এসে।

সুবিনয়ও মীরাকে একা আসতে দেয়নি—মিঃ লালও এসেছে সঙ্গে।

পুলিশ কমিশনারকে মীরাই দেখায় কেল্লাটা। পাহাড়টা সোজা নেমে গেছে খাড়ির দিকে। ওদিকটা দুর্গম। পাহাড়ে ওঠার রাস্তা একটাই। পাহাড়ের মাথায় কেল্লাটাকে আবছা চাঁদনী রাতে দেখে বলেন মিঃ ভোঁসলে—দারুণ জায়গাটা বেছেছে ওরা। রিয়েলি এ গুড এ্যান্ড সেফ স্পট।

রাতের আবছা অন্ধকারে গাড়িগুলোকে জঙ্গলের মধ্যে রেখে চারিদিকে গাছের আড়ালে পজিসন নিয়ে অপেক্ষা করছে পুলিশ।

স্বয়ং পুলিশ কমিশনারও রয়েছেন। মিঃ লাল, মীরাও রয়েছে ওদের সঙ্গে।

পুলিশ ওয়ারলেসে মেসেজ আসছে। ওরা নাকি শহর থেকে বের হয়ে এই দিকেই আসছে।

রাতের স্তব্ধতা নামে। এ যেন এক অন্তহীন প্রতীক্ষা।

দূরে দেখা যায় পাহাড়ের মাথা থেকে হাইওয়েতে হেডলাইট জেবলে গাড়িগুলো ছুটে চলেছে।

এদিকের বনপাহাড়ের রাস্তায় হঠাৎ কয়েকটা গাড়িকে ঢুকতে দেখে এরা সাবধান হয়।

গাড়িগুলো হেডলাইট নিভিয়ে আবছা চাঁদের আলোয় পথের রেখা ধরে সেই দিকে আসছে।

পাহাড়ের চড়াই-এর রাস্তায় চলে উঠছে গাড়িগুলো। এরাও পজিশন নিয়েছে।

হঠাৎ কার কণ্ঠস্বর শোনা যায়—রেডি! এ্যাকশন!

অন্ধকার উদ্ভাসিত করে চারিদিকের গাড়িগুলো থেকে পুলিশের জোরালো এমার্জেন্সী আলো জ্বলে ওঠে।

মিঃ দাশানী ডিকস্টার দল ভাবতে পারেনি যে পুলিশ গোপনে এসে তাদের আস্তানাকে ঘিরে জাল পেতে বসে আছে।

তারপরই পুলিশ মাইকে ঘোষণা শোনা যায়—পুলিশের ফোর্স তোমাদের ঘিরে ফেলেছে, সারেন্ডার করো। বাধা দেবার চেষ্টা করো না।

মিঃ দাশানী জানে কোনদিকে বের হতে হবে তাদের। তাই তাদের বন্দুকও গর্জে ওঠে একসঙ্গে ওই আলোগুলো লক্ষ্য করে।

বেশ কয়েকটা আলো নিভে যায়—অন্ধকারে তারপর শুরু হয় এক তীব্র লড়াই।

পুলিশও আজ ওদের হাতে পেয়েছে। আরও আলো জ্বলে ওঠে।

দাশানীর গুলিটা এসে লাগে মিঃ লালকে। আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ে সে।

পুলিশও এবার গুলি চালাতে থাকে। ওদের যে ভাবে হোক ধরতেই হবে।

রাত্রি শেষ হয়। শেষ হয় রক্তাক্ত সংগ্রামের। ডিকস্টা মারা গেছে। সব শেষ। আহত দাশানী ধরা পড়ে।

স্তব্ধতা নেমেছে পাহাড় বনের শূন্যতায়। মীরা আজ বোনের হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে। মিঃ লালও নেই। কলকাতার ঘরও হারিয়ে গেছে মীরার। আজ সে নিঃসঙ্গ একা।

দেখছে তাকে সুবিনয়।

মীরা দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মতো। হঠাৎ কার ডাকে চাইল সে। সুবিনয় এগিয়ে এসেছে মীরার কাছে। ওর একটা হাত মীরার হাতে। ডাকছে সে—মীরা।

চমকে ওঠে মীরা—সুবিনয়।

সুবিনয়ের চোখে আবার ফুটে উঠেছে সেই কৃতজ্ঞতা, হয়তো ভালোবাসার স্মৃতি।

বলে সে—ঘরে ফিরে চল মীরা! ভুল করে অনেক চাইতে গিয়ে শুধু ঠকেছি আমরা সবাই, সেই চাওয়ার শেষ হোক। চলো—শুভা, বিমু তোমার পথ চেয়ে আছে।

অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ে মীরা। আজ ইরার জন্য দুঃখ হয়, সে শূন্য হাতেই ফিরে গেল এই ভালোবাসার জগৎ থেকে নিজেরই ভুলে।

প্রথম সূর্যের আলো পড়েছে পাহাড় বনে। সমুদ্রের খাঁড়ির নীল জলে। সব অন্ধকার মুছে এসেছে নতুন আলোর জোয়ার।

—শেষ—